অজানা দ্বীপের রানি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

অজানা দ্বীপের রানি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

Need More Books!

Goo...

www.shishukishor.org

"Please donate our project for inprove Shishu-Kishor"

গোড়ার কথা

ফুটবল খেলা শেষ। খেলার মাঠে বসে আমরা কয়বন্ধুতে মিলে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। কারণ খেলোয়াড়দের চেয়ে, এ খেলা যারা দেখে তাদেরও খাটুনি হয় না বড়ো কম।

প্রথমে টিকিট কিনতেই তো জনতার ধাক্কায় আর কনুইয়ের গুতোয় জান হয় হয়রান, গতর যায় থেতো হয়ে; তারপর খেলা শুরু হবার আগে ঘণ্টা দুই-তিন ধরে রোদে বসে তেষ্টায় কাঠ হয়ে অপেক্ষা;—তারপর খেলার সময়ে উত্তেজিত হয়ে ষাঁড়ের মতন চিৎকার করা আর পাগলের মতন হাত-পা ছোড়া এবং মাঝে মাঝে গ্যালারি ভেঙে হুড়মুড় করে 'পপাত ধরণীতলে' হওয়া —এর পরেও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম না করলে চলবে কেন?

'মোহনবাগান' যেদিন জেতে সেদিন উৎসাহ আর আনন্দের ভিতরে তলিয়ে যায় সব কষ্টই। কিন্তু মোহনবাগানকে আজ উপর-উপরি তিন-তিনটে আস্ত গোল হজম করতে দেখে আমাদেরও সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেছে!

অসিত অত্যন্ত বিরক্ত স্বরে বলছিল,'দুত্তের নিকুচি করেছ! আর লেখা দেখতে আসব না—যেদিন আসব, সেইদিনই হারবে? ডিসগ্রেসফুল!'

অমিয় বললে, "এ কথা তো রোজই বলি, কিন্তু মোহনবাগান খেলবে শুনলে বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসেই বা থাকতে পারি কই?

পরেশ বললে, "ওই তো আমাদের রোগ; চড়ুকে পিঠ সড়সড় করে যে!

নরেশ বললে, না এসেই বা করি কী বলো? বাঙালির জীবনে আর কোনও অ্যাডভেঞ্চার নেই তো। তবু আমাদেরই জাতভাইরা গোরাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে, খানিকক্ষণ এটা দেখলেও রক্ত খানিকটা গরম হয়ে টগবগিয়ে ওঠে?

বীরেনদা এতক্ষণ চুপ করে একপাশে বসে শিস দিচ্ছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ওঃ, ফুটবল খেলা দেখা যদি অ্যাডভেঞ্চার হয়, তাহলে মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছোড়াও তো মস্ত বড়ো অ্যাডভেঞ্চার!

বীরেনদা আমাদের সকলের চেয়ে তিন-চার বৎসরের বড়ো। তাই আমরা সকলেই তাকে অনেকটা দলপতির মতোই দেখি। তর্ক-বিতর্ক হলে তাকেই মধ্যস্থ মানি, বিপদে-আপদে তার কাছ থেকেই সাহায্য পাই। সে কুস্তি জানে, বক্সিং জানে, লাঠি তরোয়াল খেলতে জানে, জাপানি যুযুৎসুরও এমন-সব আশ্চর্য প্যাঁচ জানে যে, তার চেয়ে ঢের বড়ো জোয়ানকেও চোখের নিমেষে তুলে আছাড় মারতে পারে। তার উৎসাহে আমরাও রোজ ব্যায়াম করি বটে, কিন্তু গায়ের জোরে আমরা কেউ তার কাছ দিয়েও যাই না।

এ-হেন বীরেনদা হঠাৎ প্রতিবাদ করাতে সকলে একেবারে চুপ মেরে গেল।

বীরেনদা একটু থেমে আবার বললে, 'অ্যাডভেঞ্চারের কথা তো বললে, কিন্তু আসল শক্তি আছে কি?'

আমি বললুম, বীরেনদা, তোমার কথায় আমরা তো শক্তিচর্চায় অবহেলা করি না! আমাদের গায়ে তোমার মতো জোর না থাকলেও, আমরাও নেহাত দুর্বল নই তো!

বীরেনদা বললে, "আমি সে-শক্তির কথা বলছি না—সে তো পশুর শক্তি! সাহস, সাহস—সাহসই হচ্ছে আসল শক্তি! মোষের চেয়ে চিতেবাঘের গায়ে ঢের কম জোর। তবু চিতেবাঘের কবলে মোষ যে মারা পড়ে তার কারণ মোষ হচ্ছে চিতের চেয়ে কম-সাহসী জীব। সহজে পোষ মানে, সহজে মারা পড়ে। বাঙালিরও আসল অভাব সাহসের,—তার মুখে তাই অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনলে আমার হাসি পায়।'

নরেশ বললে, বীরেনদা, আমাদের যে সাহসেরও অভাব আছে, এমন কথাই বা তুমি মনে করছ কেন?'

বীরেনদা বললে, 'মনে করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া, তাতে আর কতটুকু সাহসের দরকার! কিন্তু বাঙালির সেটুকু সাহসও নেই! তারা ঘরের কোণে শুয়ে রোগে ভুগে মরবে, তবু চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াবে না।'

পরেশ বললে, কিন্তু আমরা সে দলে নই। আমরা বাইরে বেরুতে রাজি আছি— কোথায় যেতে হবে বলো!"

গম্ভীর মুখে বীরেনদা বললে, তাহলে চলো দেখি আমার সঙ্গে!

—কোথায়?

—কাম্বোডিয়ায়।

—কাম্বোডিয়ায়? স্যায়ামের কাছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যায়ামের কাছে! পারবে যেতে?'

সবাই চুপ।

বীরেনদা হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'কী, আর কারুর মুখেই রা নেই যে? এই না বললে, তোমরা বাইরে বেরুতে রাজি আছ?

—"হ্যাঁ, রাজি আছি। আগ্রা চল, দিল্লি চল, আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু এককথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতে কি রাজি হওয়া চলে?

—'নিশ্চয়ই চলে,—তাকেই তো বলি অ্যাডভেঞ্চার! কাম্বোডিয়া তো ভারতের দরজার কাছে, যারা অ্যাডভেঞ্চার চায় তারা এককথায় উত্তরমেরুর ওপারেও যেতে রাজি হবে! দিল্লি-আগ্রা তো একটা শিশুও যেতে পারে, তাতে আর বাহাদুরিটা কী?

অসিত বললে,'বীরেনদা, তুমি কি আমাদের পরীক্ষা করছ? সত্যিই কি তুমি কম্বোডিয়ায় যেতে চাও?'

—"আমার যে কথা, সেই কাজ। আজ ক-দিন ধরে আমার মনে কাম্বোডিয়ায় যাবার সাধ হয়েছে। সেদিন সেখানকার ওঙ্কারধাম নামে এক মন্দিরের কথা পড়লুম। সেখানে নাকি বিরাট এক নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, আর তার ভেতরে এক অদ্ভুত মন্দির! সেসব প্রাচীন ভারতবাসীর কীর্তি, আর সে কীর্তির কাছে নাকি জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর, সাচীর মন্দিরও ম্লান হয়ে যায়, জানো, আমি আমার ভারতবর্ষকে কত ভালোবাসি? তাই ভারতের সেই অমরকীর্তি আমি দেখতে যাব!'

আমি বললুম, বীরেনদী, তোমার সঙ্গে আমি যাব!'

বীরেনদা আনন্দে দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললে, 'সত্যি? সত্যি বলছ সরল?

আমি হেসে বললুম, আমার নামও সরল, আমি কথাও কই সরল ভাষায়। যখন যাব বলছি, নিশ্চয়ই যাব!'

বীরেনদা বললে, "শুনে সুখী হলুম। কিন্তু সরল, ভেবে দ্যাখো, ওঙ্কারধামে যেতে গেলে বাবুয়ানা চলবে না, আরামেরও সম্ভাবনা নেই প্রথম

কয়দিন কাটবে জাহাজে—অগাধ, অপার সমুদ্রের উপরে। তারপরে রেলগাড়ি, তারপর কীসের গাড়ি—তা জানি না। হয়তো ক্রোশের পর ক্রোশ পায়ে হেঁটেই যেতে হবে প্রাণটি হাতে করে।'

—'প্রাণ হাতে করে কেন?

—'ওঙ্কারধামের ত্রিসীমানার ভিতরে লোকালয় নেই। ক্রোশের পরে ক্রোশ খালি জঙ্গল আর জঙ্গল— তেমন জঙ্গল হয়তো আমরা জীবনে চোখেও দেখিনি! গভীর অরণ্যের ভিতরে সেই প্রাচীন মন্দির আর শহরের ধ্বংসাবশেষ! অতি সাহসীরও বুক সেখানে যেতে ভয়ে কাঁপতে পারে। সেখানে মানুষের বাস নেই বটে, কিন্তু তবু মানুষ থাকাও অসম্ভব নয়। তবে সে-সব মানুষের সঙ্গে দেখা হলে আমাদের জীবন নিয়ে তারা যে টানাটানি করবে না, একথাও জোর করে বলা যায় না। তার ওপরে বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, সাপেরা সেখানে নিত্যই হোম-রুল-এর স্বাধীনতা ভোগ করছে। আমাদের মতন অতিথিদের দেখলে তারা আদর করবে না নিশ্চয়ই, কারণ তারা এখনও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়নি। তার ওপরে আছে রোগের ভয়, দৈব-দুর্ঘটনা। হঠাৎ কিছু হলে ডাক্তার নীলরতন সরকারকেও খবর দেওয়া চলবে না, অ্যাম্বুলেন্স-কার-ও ডাকা যাবে না। এ-সব কথা তলিয়ে ভেবে দ্যাখো, সরল!'

দৃঢ়স্বরে বললুম, আমি কিছু ভেবে দেখতে চাই না বীরেনদা, আমি খালি তোমার সঙ্গে যেতে চাই।'

অমিয় আচম্বিতে বলে উঠল, আমিও কিছু ভাবব না বীরেনদী, তোমার সঙ্গে পোটলা বেঁধে বেরিয়ে পড়ব।"

বীরেনদা সবিস্ময়ে বললে, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে!'

—‘কেন যাব না, আমি কি কাপুরুষ?

—না, তোমার কথা শুনে তোমাকে আর কাপুরুষ বলতে পারি না, কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে কেমন করে যাবে? তুমি তো সরলের মতন স্বাধীন নও, তোমার মা আছেন, বাবা আছেন। তারা তোমাকে যেতে দেবেন কেন?

অমিয় বললে, “আচ্ছা, মা-বাবাকে রাজি করাবার ভার আমার ওপরে রইল। বীরেনদা, তুমি জানো না তোমার ওপরে আমার মা আর বাবার কতখানি শ্রদ্ধা! এই সেদিন কথায় কথায় বাবা বলছিলেন, ‘বীরেন সঙ্গে থাকলে অমিয়কে আমি যমেরও মুখে ছেড়ে দিতে পারি। বীরেন যে দুর্ভেদ্য বর্ম—দেবরাজের বজ্রও সে বর্মে লেগে ভেঙে গুড়ো হয়ে যায়। তুমি কি মনে করো বীরেনদা, আমার বাবা মিছে কথা বলছিলেন?

বীরেনদা মৃদু মৃদু হেসে বললে, 'না, তা বলি না, তবে তার বিশ্বাস অন্ধ হতেও পারে তো?”

অমিয় বললে, “তোমাকে যে চিনেছে সেই-ই এই কথা বলবে। তোমার সঙ্গে মরতেও আমার ভয় করে না। আমি তোমার সঙ্গে যাব বীরেনদা!

—“বেশ, তোমার মা-বাবা যদি মত দেন, আমারও অমত নেই।’

আমি বললুম, তাহলে কবে আমরা রওনা হচ্ছি?

—দু-হপ্তার ভেতরে। কিন্তু যাবার আগে তিনটে বন্দুকের পাস চাই। রিভলভার তো আমার কাছেই আছে। জঙ্গলের ভেতরে বন্দুক-রিভলভারের মতন বন্ধু আর নেই।’

অসিত বললে, তাহলে সত্যিই তোমরা যাবে?

বীরেনদা বললে, "তোমার সন্দেহ হচ্ছে নাকি?'

পরেশ বললে, আমি একে সাহস বলি না, এ হচ্ছে গোয়ারতুমি।

নরেশ বললে, "তা নয় তো কী?"

বীরেনদা বললে, "বেশ, আমরা একটু গোয়ারতুমি করেই দেখি না কেন? তোমাদের মতন বুদ্ধিমান মাথা-ঠান্ডা লোকেদের অ্যাডভেঞ্চার-এর জন্যে ফুটবল খেলার মাঠ আছে, বায়স্কোপের ছবি আছে, ট্রামগাড়ির বাঁধানো রাস্তা আছে, আর ম্যালেরিয়া জ্বরে শুয়ে শুয়ে আরাম করে কাঁপবার জন্যে নরম বিছানা আর পুরু লেপ আছে। কিন্তু গোয়াররা উড়োজাহাজ চড়ে, হিমালয়ের টঙে ঠান্ডা হাওয়া খেতে ওঠে, সাব মেরিনে বসে সমুদ্রের অতলে ডুব দেয়—খালি মরবার জন্যেই। কিন্তু তারা না মরলে তো সারা পৃথিবীর মানুষ আজ বাঁচতে পারত না! গোয়াররা মরতে জানে বলেই মানুষ হয়েছে আজ শ্রেষ্ঠ জীব!'

ভারতের অশ্রু

নীলিমার অসীম জগতে চলেছি, ভেসে চলেছি!

মাথার উপরে প্রশান্ত নীল আকাশ, পায়ের তলায় অশান্ত নীল সাগর,—যেদিকে তাকাই, আর কোনও রং নেই! বিশ্বময় যেন থই থই করছে নীলিমা!

এরই মাঝখান দিয়ে জাহাজ ভেসে চলেছে সিন্ধুর বুকে বিন্দুর মতো, এমন একে রেখে, নীল পটে সাদা ফেন-আলপনায় দীঘল রেখা!

পৃথিবীর মাটির গান আর শোনা যায় না—বনের মর্মর, পাখির রাগিণী, নদীর তান! বাতাস শুধু মাটির স্মৃতি বহন করে আনছে, কিন্তু তার উদাসী নিশ্বাস আজ হারিয়ে ফেলেছে ফুলের মৃদু গন্ধ!

কী বিস্ময়! কী আনন্দ!—চারিদিক থেকে আজ যেন আমাদের আকুল আহ্বান করছে অনন্ত !

অমিয় উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠল—‘বীরেনদী, বীরেনদা! আমাদের এতদিনের চেনা পৃথিবী যে দু-দিনেই এমন অচেনা হয়ে উঠতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি তো! বীরেনদা হেসে তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, ‘মায়ের কোলে শুয়ে আর ইস্কুলবই পড়ে কি পৃথিবীকে চেনা যায় ভাই? কূপে বসে ব্যাং যেমন দেখে জগৎ কূপের মতো, ঘরে বসে আমরাও তেমনি দেখি পৃথিবীকে চার দেওয়ালের মাঝে বন্দিনীর মতো! কিন্তু আজ আমরা স্বাধীন পৃথিবীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি—স্বাধীনতার যে কত রূপ এবারে আমরা চোখের সামনে তা দেখতে পাব!’

আমি বললুম, কিন্তু দেশের জন্যে আমার বড়ো মন কেমন করছে বীরেনদা মনে হচ্ছে পৃথিবীর যত রূপই থাক, আমার বাংলা দেশে বসে সবুজ গাছপালার ভিতরে, ধানদোলানো সোনা-ছড়ানো মাঠের উপরে যে অপরূপ রূপ দেখি, সে রূপের চেয়ে মিষ্টি যেন আর কিছুই নেই!

বীরেনদা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

আমি বললুম, তুমি হাসছ বীরেনদা? কুনো বাঙালি ভেবে মনে মনে আমাকে বুঝি ঘৃণা করছ?

বীরেনদা গম্ভীর হয়ে বললে, না ভাই সরল, আমি কি তোমাকে ঘৃণা করতে পারি? তুমি মানুষ, তাই দেশের জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদছে! তোমাকে শ্রদ্ধা করি। দ্যাখো না, এই যে ইংরেজ জাত, দেশ ছেড়ে তারা পৃথিবীর কোথায় না যায়? তা বলে তাদের প্রাণ কি কাঁদে না? কাঁদে বই কি! তবু তারা দেশ ছাড়ে দেশকেই বড়ো করবার জন্যে। কিন্তু তারা যেখানেই থাক—আফ্রিকার জঙ্গলে, সাহারার মরুপ্রান্তরে আর হিমালয়ের তুষার-শিখরে বসে তারা শুধু এক গানই গাইবে—হোম, হোম, সুইট হোম'। বিলাতের কুয়াশাকেও তারা ভালোবাসে। আর আমাদের বাবুসাহেবরা? বিলাতে গিয়ে তারা স্বদেশই ভুলতে চান! পরেন হ্যাট-কোট, ধরেন ফিরিঙ্গি চাল আর স্বপ্ন দেখেন ইংরেজিতে! বাংলা ভাষা ভুলে যাওয়া তাদের কাছে জাঁকের কথা! তাদের আমি ঘৃণা করি সরল, কারণ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি',—এ গান তারা গাইতে জানে না! দেশের জন্যে আমাদের মন কাঁদবে বই কি,—আমরা তো দেশকে ভোলবার জন্যে বিদেশে যাচ্ছি না ভাই, আমরা যে যাচ্ছি স্বদেশকে ভালো করে চেনবার জন্যে!"

অমিয় বললে, 'স্বদেশকে ভালো করে চেনবার জন্যে?

—'হ্যাঁ ভাই! আমরা যাচ্ছি আমাদের সোনার ভারতের গৌরব দেখবার জন্যে। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে গেলে ভারতের বাইরে বসেও ভারতের মূর্তিকে আরও বড়ো করে দেখতে পাব?

আমি বললুম, ওঙ্কারধাম তো অজন্তা, ইলোরা, ভুবনেশ্বরের কি মাদুরার মন্দিরের মতনই একটি মন্দির?

—'না, ওঙ্কার হচ্ছে প্রাচীন হিন্দুজাতির আরও বড়ো কীর্তি, তোমার ইলোরা কি ভুবনেশ্বরের মন্দির বিপুলতায় তার কাছে দাঁড়াতেও পারে না। সাগর পার হয়ে কৌণ্ডিল্য নামে এক ব্রাহ্মণ প্রায় দুই হাজার বছর আগে কাম্বোজে হিন্দু রাজত্বের সূচনা করেন। কয় শত বৎসর পরে সেই ছোটো উপনিবেশ একটা বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তার রাজধানীর নাম হয় যশোধরপুর। আমরা ভারতের বাইরে সেই ভারতকেই দেখতে চলেছি—যেখানে সাতশো বছর ধরে উড়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের বিজয়-পতাকা। যশোধরপুরের ধ্বংসাবশেষ আজ ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছে, তার অগুনতি মন্দিরের ভিতরে একটিতেও আজ সন্ধ্যাদীপ জ্বালবার মানুষ নেই। দেশের জন্যে এখনই তোমার প্রাণ কাঁদছে তো সরল, কিন্তু যশোধরপুরে গিয়ে আমরা কী করব বলো দেখি?

—"আমরা কী করব বীরেনদা?

—"কাদব!'

—'কাদব! কেন?'

—'একদিন যে হিন্দু নিজের বীরত্বে সমুদ্রের ওপারে বিপুল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, ভারতের বাইরেও ভারতবাসীর জন্যে নতুন আর স্বাধীন স্বদেশ তৈরি করেছিল, আজ তারই সন্তানের সেখানে গিয়ে কাঁদবার

অধিকার ছাড়া আর কোনও অধিকারই যে নেই! হ্যাঁ সরল, যশোধরপুরের ধ্বংসাবশেষের উপরে আমরা কেবল ফোটা-কয়েক অশ্রু রেখে আসব।'

বলতে বলতে বীরেনদীর গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল, আমরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম তার দুই চোখে ভরে উঠেছে অশ্রুজল। ভারতবর্ষকে কত ভালোবাসে বীরেনদা!

জাগরণের দেশ

আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুরে এসে পৌছল। জাহাজ এখানে অনেকক্ষণ থামবে শুনে আমরা তীরে নেমে পড়লুম। আজ ক-দিন পরে ডাঙার মানুষ পায়ের তলায় আবার মাটিকে পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

সিঙ্গাপুরের কথা সকলেই জানেন, কাজেই সে কথা আমি আর এখানে বলতে চাই না। সিঙ্গাপুরে নানাজাতীয় রকম-বেরকমের মুখ দেখলুম—এ শহরটা যেন দুনিয়ার নানা জাতির চেহারার নমুনা নেবার জায়গা। এখান থেকে আমরা কোচিন-চিনের বন্দর সাইগনে যাত্রা করব—সেও প্রায় চার দিনের পথ। তার পর সেখান থেকে যাব যশোধরপুরের ওঙ্কারধামে।

জাহাজ যখন সিঙ্গাপুর ছাড়ল, দেখলুম যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই নতুন যাত্রীরা সবাই প্রায় চিনেম্যান।

অমিয় বললে, "এইবার থেকে থ্যাবড়া-নাকের দেশ শুরু হবে!'

বীরেনদা বললে, 'না অমিয়, এইবার থেকে স্বাধীন এশিয়া শুরু হবে! ঘুমের দেশ থেকে এইবার আমরা জাগরণের দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি—যে-দেশ সাদা চামড়ার লোহার বেড়ি পায়ে পরেনি!

আমরা চলেছি উত্তর দিকে—বা দিকে আছে মালয় উপদ্বীপ।. দ্বিতীয় দিনের রাত্রে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে গেল!—জেগে উঠেই শুনি ভীষণ গোলমাল, বন্দুকের শব্দ, অনেকগুলো পায়ের ছুটো-ছুটির আওয়াজ, অনেকগুলো কণ্ঠের চিৎকার আর আর্তনাদ!

আমাদের দুজনকে কামরা থেকে বেরুতে বারণ করে বীরেনদা তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গেল।

হতভম্বের মতন বসে আছি, বীরেনদা আবার দ্রুতপদে ফিরে এসে কামরার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে—তার মুখ বিবর্ণ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কী হয়েছে বীরেনদা?

—“বোম্বেটে!

—“বোম্বেটে?

—‘হ্যাঁ, সিঙ্গাপুর থেকে একদল বোম্বেটে যাত্রী সেজে জাহাজের উপরে উঠেছিল। তারা জাহাজের লোকদের আক্রমণ করেছে।’

আমি আর অমিয় এক লাফে বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলুম।

বীরেনদা বললে, এই চিনে-সমুদ্র হচ্ছে বোম্বেটের স্বর্গ। এ বোম্বেটেরা বড়ো নিষ্ঠুর, কারুকে এরা ক্ষমা করে না।—সরল, অমিয়া’

বন্দুকের বাক্স খুলতে খুলতে আমি বললুম, তাহলে কি আমাদের এখন বোম্বেটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?

—বোম্বেটেরা দলে ভারী, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃথা। তবে এও ঠিক যে, আমরা কাপুরুষের মতন মরব না। কী বলো সরল? কী বলো অমিয়?

অমিয় বীরেনদার পাশে দাঁড়িয়ে বললে,“আমি তো আগেই বলেছি বীরেনদা তোমার সঙ্গে মরতেও আমার ভয় করে না!”

বীরেনদা বললে, জানি, তোমরা হচ্ছ খাটি ইস্পাত, দুমড়োলেও ভাঙবে না! বাইরে যাত্রীদের কান্না আর বোম্বেটেদের চিৎকার আরও বেড়ে

উঠল। বীরেনদা বললে, কাপুরুষদের কান্না শোনো! ওরা ভুলে গেছে, কেঁদে কেউ কোনওদিন বাঁচতে পারে না!'

অমিয় বললে, বীরেনদী, লড়াই করবার জন্যে আমার হাতদুটো নিসপিস করছে?

—সব যথাসময়ে ভাই, সব যথাসময়ে! মরবার সময় এলে হাসিমুখেই মরব, কিন্তু এখন দেখা যাক বাঁচবার কোনও উপায় আছে কি না।'

আমি বললুম, ডাঙা হলেও কথা ছিল, কিন্তু এ যে অগাধ সমুদ্র বীরেনদা! মুক্তির কোনোই উপায় নেই!'

—'গোলমালটা হচ্ছে জাহাজের বাঁ দিকে। ডান দিকে কোনও সাড়া শব্দ নেই! আচ্ছা, তোমরা আমার পিছনে চুপি চুপি এসো। আমি না বললে কিন্তু বন্দুক ছুড়ো না। —এই বলে বীরেনদা কামরার দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বা দিকে একবার চেয়ে দেখলে। তারপর আমাদের ইঙ্গিত করে ডান দিকের পথ ধরলে। আমরা দুজনে গুড়ি মেরে তার পিছনে পিছনে চললুম।

জাহাজের এদিকটা অন্ধকার, সমুদ্রের বুকে অন্ধকার, আকাশেও আলোর রেখা নেই। আচম্বিতে কী-একটা শব্দ হল, পরমুহূর্তেই বীরেনদা সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং তার পরেই সমুদ্রের ভিতর ঝপাং করে আর-একটা শব্দ!

কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা দুজনেও দাঁড়িয়ে পড়লুম।

চুপিচুপি বললুম, কী হল বীরেনদা?

—‘একটা বোম্বেটে কমল! অন্ধকারের ভেতর থেকে লোকটা হঠাৎ আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে জানত না যে আমার এই হাতদুটো ছ-মন বোঝা তুলতে পারে! তোমরা টের পাবার আগেই, একটা টু-শব্দ করতে না করতেই তাকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়েছি! পাতালে যেতে তার আর দেরি লাগবে না?

যে-হাত এত সহজে এমন কাণ্ড করতে পারে, অন্য সময় হলে সে-হাতের শক্তির কথা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ভাবতুম! কিন্তু এখন আর ভাববার সময় নেই, কারণ পিছনে কাদের চিৎকার আর পদশব্দ শুনলুম!

বীরেনদা বললে, সাবধান! দৌড়ে আমার সঙ্গে এসো!

কিন্তু বেশি দূর দৌড়তে হল না–আমরা একেবারে জাহাজের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালুম। তারপরেই রেলিং, আর তার নীচেই সমুদ্র!

বীরেনদা বললে, ‘আপাতত আমরা বেঁচে গেলুম!

—‘কী করে বীরেনদা, বোম্বেটেরা যে এসে পড়ল!’

—‘না, ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। এদিকে কোনও কামরা নেই, ওরা বোধ হয় খানিকক্ষণ এদিকে আসবে না। কিন্তু তার আগেই আমরা নিরাপদ হতে চাই! আমি এদিকে এসেছি কেন জানো? এই দড়িগুলোর জন্যে! এই দড়িগুলো যে এখানে আছে, আমি দিনের বেলাতেই তা দেখেছিলুম।

সেখানে অনেকগুলো কাছি কুণ্ডলী-পাকানো অজগরের মতন পড়ে আছে বটে।

আমি বললুম, কিন্তু এ দড়িগুলো নিয়ে আমরা করব কী?

বীরেনদা বললে, 'দেখছ, এই দড়িগুলো জাহাজের সঙ্গে বাঁধাই আছে? তিনগাছা দড়ি সমুদ্রের ভিতরে ফেলে, আপাতত আমরা কি আর-একটা রাত দড়ি ধরে ভাসতে পারব না?'

—"কিন্তু তারপর?'

—'পরের কথা পরে ভাবা যাবে! আবার পায়ের শব্দ শুনছি, নাও– আর দেরি নয়! বীরেনদীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এক এক গাছা দড়ি সমুদ্রের ভিতরে ফেলে দিলুম। অনেক জিমনাস্টিক করেছি, সুতরাং দড়িগুলো ধরে নীচে নেমে যেতে আমাদের কোনোই অসুবিধা হল না!

সমুদ্রের জল যখন আমার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করেছে, বীরেনদা হাসতে হাসতে বলে উঠল, আমরা অ্যাডভেঞ্চার খুঁজছিলুম, কিন্তু আর তাকে খুঁজতে হবে না, কী বলো সরল?'

আমি বললুম, তবে এ অ্যাডভেঞ্চার-এর গল্প দেশে গিয়ে করতে পারব না, এই যা দুঃখ!!

অমিয় বললে, সেদিন তুমি বলছিলে না বীরেনদা, আমরা জাগরণের দেশের দিকে যাচ্ছি? সে কথা ঠিক! আজ সারা রাতই আমাদের আর ঘুমোতে হবে না!

আমি বললুম, হায় হায়! তিন-তিনটে ভারত-সন্তান জেগে উঠে মোটা কাছি নিয়ে গভীর রাতে যে আজ সাগর-মন্থনে নেমেছেন, যারা স্বদেশি কবিতা লেখেন এ দৃশ্য তারা দেখতে পেলেন না তো!'

অমিয় দড়ি ধরে ভাসতে ভাসতে গুনগুন করে একটা হাসির গান গাইতে লাগল এবং তার সঙ্গে শিস দিতে শুরু করলে বীরেনদা।

মস্তবড়ো হাঁ আর ধারালো দাঁত

অন্ধকারের তরঙ্গ বইছে মাথার উপরে,—সমুদ্রের তরঙ্গ বইছে দেহের চারিপাশ ঘিরে!— দড়ি ধরে আমরা ভাসছি আর ভাসছি, যা দেখছি আর অনুভব করছি এ কি সত্য, এ কি স্বপ্ন?

হঠাৎ আমাদের আশেপাশে ঝপাং করে শব্দ হতে লাগল!—যেন উপর থেকে কী সব পড়ছে! ভাবলুম, বোম্বেটেরা নিশ্চয় টের পেয়েছে যে, জাহাজের সঙ্গে আমরাও দড়ি ধরে ভেসে চলেছি, তাই আমাদের মারবার জন্যে ভারী ভারী জিনিস ছুড়ছে।

কিন্তু বীরেনদা বললে, "আমি শুনেছি, বোম্বেটেরা যখন জাহাজ দখল করে তখন মাঝে মাঝে যাত্রীদের হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দেয়। আমাদের চারিদিকে যেসব শব্দ হচ্ছে, নিশ্চয় তা এক-একটা লাশ পড়ার শব্দ?

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল!—জাহাজের উপরে থাকলে আমাদেরও তো এই অবস্থা হত। এতক্ষণে আমাদেরও দেহ হয়তো চিন-সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে চলে যেত কোথায় কে জানে!

আচম্বিতে আমার খুব কাছেই একটা শব্দ হল–এত কাছে যে, সমুদ্রের জল ছিটকে আমার চোখে-মুখে লাগল! একটু পরেই কি একটা জিনিস আমার গায়ে এসে ঠেকল! হাত দিয়ে সেটাকে ঠেলে দিতে গিয়েই বুঝলুম, মানুষের দেহই বটে।–ঠান্ডা, অস্বাভাবিক ঠান্ডা, জ্যান্ত মানুষের দেহ এত ঠান্ডা হয় না!

তাড়াতাড়ি দেহটাকে দূরে ঠেলে আমি অস্ফুট চিৎকার করে উঠলুম!

বীরেনদা বললে, 'কী হল, কী হল সরল?

আমি শিউরোতে শিউরোতে বললুম, একটা মড়া! আমি একটা মড়ার গায়ে হাত দিয়েছি।”

বীরেনদা বললে, সেজন্যে আঁতকে উঠলে কেন?

—‘জীবনে এই প্রথম আমি মড়ার গায়ে হাত দিলুম! হাত দিতেই আমার দেহের ভিতরটা যেন কীরকম করে উঠল!’

—সেজন্যে আজ আঁতকে উঠে লাভ নেই সরল! যে-অবস্থায় আমরা পড়েছি, কালকে হয়তো আমাদেরই ওই-রকম মড়া হতে হবে! রবিঠাকুরের ভাষায় এখন আমাদের ‘জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য’ –প্রাণ নিয়ে এখন আমাদের খেলা করতে হবে–তা সে প্রাণ নিজেরই হোক, আর পরেরই হোক!’

অমিয় বললে, ‘বীরেনদা, সেদিন একটি কবিতা পড়েছিলুম আজ আমার তাই মনে হচ্ছে!’

বীরেনদা বললে, শাবাশ অমিয়, তুমি বাহাদুর ছেলে বটে! এমন সময়েও তোমার কবিতার কথা মনে হচ্ছে?

—‘কবিতার খানিকটা শোনো

মরণ আমার খেলার সাথি,
জীবনও মোর তাই,
এই দুনিয়ায় খেলতে আসা;
ভাবনা কিছুই নাই!
অট্টহাসি হাসছি মুখে,
মরেও আমোদ পাই–
হো হো, ভাবনা কিছুই নাই!

— সত্যি বলছি বীরেনদা, আজকের রাতটিকে আমার ভারী ভালো লাগছে!'

প্রথম সূর্যোদয় দেখলুম! কালকের রাতে যে-সব হতভাগ্যের বুকের রক্ত সমুদ্রের ওপরে ঝরে পড়েছে, যেন তাই মেখেই রাঙা হয়ে জলের ভিতর থেকে সূর্যদেব আজ তার মাথা তুলে নীলাকাশের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন!

কোনওদিকে তীরের আভাস পেলুম না–থই থই করছে খালি অনন্ত নীল জল। জাহাজের ওপরে নিরাপদে বসে এই কয়দিন সমুদ্রকে যেমন মধুর লাগছিল, আজ আর তেমনটি লাগল না।

সারা রাত জলে থেকে এখন সকালের বাতাসে দেহের ভিতরে শীতের কাঁপুনি ধরল। তার উপরে নানান ভাবনা। সমুদ্রে ভেসে না-হয় বোম্বেটের ছুরি থেকে আপাতত রেহাই পেয়েছি, কিন্তু মানুষের দেহ তো লোহা কি পাথর নয়, এমন ভাবে জলের ভিতরে আর ক-দিন থাকতে পারব? আর না হয় জলেরই ভিতরে কোনওরকমে রইলুম, কিন্তু কী খেয়ে বেঁচে থাকব?

অমিয় আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, "হাঙর। হাঙর!

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি, মস্তবড়ো একটা হাঁ, আর তার ভিতরে কতকগুলো ধারাণো চকচকে দাঁত! সাদা মাছের মতো প্রকাণ্ড একটা দেহও চোখে পড়ল! কিন্তু পরমুহূর্তেই দেহটা জলের ভিতরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়ে মিলিয়ে গেল।

বীরেনদা দড়ি ধরে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, ‘ওপরে ওঠো, ওপরে ওঠো! অমিয়ের সঙ্গে আমিও দড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলুম এবং পরপলকেই দেখলুম, হাঙরটা ঠিক আমাদের নীচে এসে হাজির হয়েছে!

শিকার পালিয়েছে দেখে সে যে খুবই খাপ্পা হয়েছে, তার প্রমাণ দেবার জন্যে জল থেকে আমাদের দিকে আমাদের মস্ত একটা লম্ফ ত্যাগ করলে, কিন্তু আমরা তখন তার নাগালের বাইরে।

তবু সে আশা ছাড়লে না–জাহাজের পিছনে পিছনে আসতে এবং মাঝে মাঝে দাঁত বার করে কুৎসিত হাই তুলতে লাগল!

এদিকে দড়ি ধরে ওপরে ঝুলতে ঝুলতে আমাদের হাত ভেরে এল–অথচ আমাদের এখন ওপরে ওঠবারও জো নেই বোম্বেটের ভয়ে এবং জলে নামবারও উপায় নেই হাঙরের ভয়ে!

এমন সময়েও আমি ঠাট্টা করবার লোভ সামলাতে পারলুম না। অমিয়কে জিজ্ঞাসা করলুম, কী ভায়া, এমন অবস্থায় পড়লে তোমার কবি কী বলতেন? মরণকে কি তার খেলার সাথি বলে মনে হত?

অমিয় তখনও দমবার পাত্র নয়। সে হেসে বললে, “আচ্ছা সরলদা, হাঙরের ক-টা দাঁত আছে গুনে দ্যাখো দেখি।’

আমি অগত্যা মনে মনে হার মেনে প্রকাশ্যে বললুম, সেজন্যে এখনই মাথা ঘামাবার দরকার নেই। একটু পরে সকলকেই তো হাঙরের পেটের ভিতর ঢুকতে হবে, তখন দাঁত গুনে দেখবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে!’

অমিয়ের মুখ তখন রাঙা-টকটকে হয়ে উঠেছে, সে যেন নিজের কণ্ঠ প্রাণপণে চাপতে চাপতে বললে, না সরলদা, আমাকে কিন্তু এখনই

মাথা ঘামাতে হচ্ছে। আমার হাত একেবারে অবশ হয়ে গেছে, আমাকে এখনই হাঙরের পেটের ভিতরেই যাত্রা করতে হবে!’

বীরেনদা তাড়াতাড়ি জামার ভিতর দিকে হাত চালিয়ে একটা রিভলবার বার করে বললে, “বোম্বেটেরা পাছে শুনতে পায় সেই ভয়ে এতক্ষণ রিভলভার ছুড়তে পারছিলুম না। কিন্তু এখন দেখছি না ছুড়ে আর উপায় নেই। —বলেই সে হাঙরটিকে লক্ষ্য করে উপরিউপরি দু-বার রিভলভার ছুড়লে।

হাঙর-বাবাজি মানুষের বদলে দু-দুটো গরম সিসের গুলি খেয়েই চো করে জলের তলায় ডুব মারলে! বাঁচল কি মরল জানি না, তবে জলের ওপরে দেখা গেল, খানিকটা রক্তের দাগ!

রিভলভারের আওয়াজ যে জাহাজের ওপর থেকে কেউ শুনতে পেয়েছে, তারও কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। আমরা তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার জলের ভিতরে নামলুম।

দড়ি কে টানে

সকালবেলায় সূর্যকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলুম। কিন্তু তখন ভাবতে পারিনি যে, সেই সূর্যকেই পরে অভিশাপ দিতে হবে!

কে আগে জানত যে, রোদে সমুদ্রের জলও এমন গরম আর সূর্যের তাপ এমন অসহনীয় হয়ে ওঠে? তরঙ্গের সঙ্গে নৃত্যশীল সূর্যকিরণ যে এত তীব্র হয়ে উঠে চোখ প্রায় কানা করে দিতে পারে, তাও আমাদের জানা ছিল না।

একে কাল রাত থেকে একটোকও জল পান করিনি, তার উপরে সূর্যের এই অত্যাচার! সমুদ্রের বিপুল জলরাশির ভিতরেও বারংবার ডুব দিয়ে মনে হতে লাগল, বুকের ভিতরটা যেন মরুভূমির মতন শুকিয়ে গিয়েছে–জল নেই, সেখানে এক ফোটাও জল নেই!

অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! এত জল এখানে, অথচ জলাভাবে আমরা মরতে বসেছি। এক-একবার আর সইতে না পেরে সমুদ্রের জলে চুমুক দি, আর তা ভীষণ নোনতা বলে তখনই উগরে ফেলতে পথ পাই না! অমন নীলপদ্মের নীলিমা-মাখানো সুন্দর জল, কিন্তু তা পান করা কী অসম্ভব!

কাল থেকে ঘুমোইনি। সারাদিন আহারও নেই। তার উপরে সমানে দড়ি ধরে ঝুলে থাকা–জলের ভিতরে ভাসছি বটে, কিন্তু হাতদুটো যেন ছিড়ে পড়ছে!

জাহাজ সমানে চলেছে–কিন্তু তখনও কোনওদিকে ডাঙা দেখা যাচ্ছে না। তারপর সূর্য যখন অস্ত গেল, তখন আমরা প্রায় মরো মরো হয়ে

পড়েছি। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল, ধীরে ধীরে আবার সেই অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতে লাগল– যে অন্ধকারের ভিতর কাল এক রাত্রেই আমাদের জীবনটা উলটে-পালটে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে!

সন্ধ্যা এল, আঁধার এল, রাত্রি এল। কিন্তু সূর্যের তাপে কণ্ঠের ভিতরে যে তৃষ্ণার আগুন জ্বলে উঠেছে, সে আগুন না-নিবে প্রবল হয়ে উঠল দ্বিগুণতর।

আমি বললুম, বীরেনদা, মরতে আমি ভয় পাই না, কিন্তু এমন তিলে তিলে মরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া ভয়ানক নয় কি?’

অমিয় বললে, ‘হ্যাঁ সরলদা, এবারে আমিও তোমার সঙ্গে একমত। এমন বেঁচে থাকার কষ্ট আর সওয়া চলে না! তার চেয়ে এসো, আমরা দড়ি ছেড়ে ডুব দি, পাঁচ মিনিটেই সব ব্যথা জুড়িয়ে যাবে।

বীরেনদা একটাও কথা কইলে না। জাহাজের ছায়া যেখানে জলের উপরে শেষ হয়েছে তার পরের অনেকখানি জায়গা আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ আলো আসছে জাহাজের উপর থেকে। এই আলো দেখছি আর মনে হচ্ছে, আমরা অন্ধকারে অনাহারে অনিদ্রায় তৃষ্ণায় আর পরিশ্রমে মরণোন্মুখ হয়েছি, আর জাহাজের ওপরে আলোকিত কক্ষে বসে একদল হত্যাকারী শয়তান–

আমার চিন্তায় বাধা দিয়ে অমিয় বললে, বীরেনদা, আর নয়,—এই আমি দড়ি ছাড়লুম!

বীরেনদা বললে, না অমিয়, আর একটু অপেক্ষা করো।

—আর অপেক্ষা করে মিছে কষ্ট বাড়াই কেন বীরেনদা? মরণ আমাদের ধরবার আগে আমরাই কেন মরণকে এগিয়ে গিয়ে ধরি না?

বীরেনদা বললে, একটু সবুর করো। আমি একবার জাহাজের ওপরে গিয়ে দেখে আসি, কোনও উপায় আছে কি না?

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলুম, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

—না না, তাহলে গোলমাল হবার সম্ভাবনা। আমি একলাই যাব।

—কিন্তু তুমি যদি বিপদে পড়?

—তাহলে তোমরা দুজনে থাকলেও কোনও উপকার হবে না।

—এই বলে বীরেনদা দড়ির সাহায্যে আবার উপরে উঠতে লাগল।

পনেরো মিনিট। আধ ঘণ্টাও কেটে গেল বোধ হয়। আমি বললুম, অমিয়, এখনও বীরেনদার দেখা নেই! অমিয় বললে, "আমি যেন উপর থেকে মাঝে মাঝে কাদের হট্টগোলের শব্দও শুনতে পেয়েছি! চলো, আমরাও উপরে উঠি।

—না, আর-একটু দেখি। বীরেনদার কথা অমান্য করা উচিত নয়।'.

বোধ হয় আরও আধ ঘণ্টা গেল। তবু বীরেনদার দেখা নেই! আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল–নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেলুম।

অমিয় বললে, 'সরলদা, আর নয়–বীরেনদা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছেন!

আমি বললুম, হ্যাঁ, চলো, আমরাও উপরে উঠি। এখানে এমন করে মরার চেয়ে উপরে গিয়ে বীরের মতন মরা ঢের ভালো।-

আমার কথা শেষ হতে না হতেই উপর থেকে একসঙ্গে আমাদের দুজনেরই দড়িতে টান পড়ল, কারা যেন আমাদের টেনে তুলছে।

আমি হতাশভাবে বললুম, না অমিয়,—এ বীরেনদা নয়! দেখছ না, একসঙ্গে আমাদের দুজনেরই দড়িতে টান পড়েছে, নিশ্চয়ই একজনের বেশি লোক দড়ি ধরে টানছে।

— তবে কি–

—হ্যাঁ, আর কোনও সন্দেহ নেই,—বোম্বেটেরা আমাদের কথা টের পেয়েছে?

—'আমরা যদি দড়ি ছেড়ে দি?'

–'সমুদ্রে ডুবে মরব।'

নীলগোলাপের ছাপ

আমরা ক্রমেই উপরে উঠছি! মানুষ ছিপের সুতোয় বেঁধে টেনে তোলবার সময়ে মাছবেচারাদের মনের ভাব যে-রকম হয়, আমাদেরও মনের অবস্থা তখন বোধ করি অনেকটা সেই রকমই হয়েছিল!

নীচে অতল সমুদ্র যেন হাঁ করে আছে—আমাদের গিলে ফেলবার জন্যে, আর উপরে প্রস্তুত হয়ে আছে বোম্বেটেদের নিষ্ঠুর তরবারি—আমাদের ধড় থেকে মুণ্ডটা তফাত করে ফেলবার জন্যে! .

অমিয় বললে, সরলদা, এসো আমরা দড়ি ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি!

আমি হতাশভাবে বললুম, তাতে আর লাভটা কী হবে ভাই?

—'বোম্বেটেরা তো আমাদের ধরতে পারবে না!'

—কিন্তু সমুদ্রের গ্রাস থেকেই বা বাঁচব কেমন করে? এ তো আর পুকুর কি নদী নয়, যে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যাব!'

—কিন্তু ছোরা-ছুরির খোঁচা খেয়ে মরার চেয়ে কি ঠান্ডা জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া ঢের ভালো নয়?

ততক্ষণে আমরা জাহাজের ডেকের কাছে এসে পৌছেছি। চার-পাঁচ জন লোক উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে আগ্রহভরে আমাদের দেখছে! একজনের হাতে লণ্ঠন, তারই আলোয় দেখলুম—প্রত্যেকেরই নাক খ্যাদা আর চোখগুলো কুতকুতে। তারা সকলেই চিনেম্যান!

অমিয় আবার বলে উঠল, সরলদা! এখনও সময় আছে—দড়ি ছেড়ে দাও, এদের হাতে পড়ার চেয়ে ডুবে মরা ভালো!

সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে বীরেনদার গলার আওয়াজে শুনলুম, না অমিয়, দড়ি ছেড়ে না! তোমরা উপরে উঠে এসো!

বীরেনদা বেঁচে আছে! আমাদের উপরে যেতে ডাকছে! বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলুম! বীরেনদার গলা পেয়ে অমিয় আর ইতস্তত করলে না, চটপট দড়ি বেয়ে তখনই ডেকের উপর গিয়ে উঠল!..আমিও তাই করলুম।

উপরে গিয়ে দেখলুম, অদ্ভুত দৃশ্য! পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সকলেই প্রায় চিনেম্যান, তবে তিন-চার জন কালো চেহারার লোকও দলের ভিতরে ছিল–দেখলে তাদের ভারতবাসী বলেই মনে হয়।

বীরেদা দাঁড়িযে আছে বুক ফুলিয়ে তাদের মাঝখানে — নিজের দীর্ঘ দেহ নিয়ে, সকলের মাথার উপরে মাথা তুলে। বীরেনদার মাথায় একখানা কাপড় জড়ানো-—কাপড়খানা রক্তে রাঙা। তার জামাকাপড়ও স্থানে স্থানে ছিড়ে গিয়ে দেহের লোহার মতো কঠিন মাংসপেশিগুলো প্রকাশ করে দিয়েছে। দেখেই বুঝলুম, বীরেনদার সঙ্গে বোম্বেটের বিলক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে।

অন্যান্য মুখগুলোর উপরেও তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে গেলুম–সে-সব মুখের উপরে শয়তানি আর পশুত্বের ছাপ সুস্পষ্ট, তারা ভুলেও যে কখনও দয়া-মায়ার স্বপ্ন দেখেছে, এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের দিকে তারা তাকিয়ে আছে–যেমন করে তাকায় ইঁদুরের দিকে বেড়ালরা!

অমিয় বললে, ‘বীরেনদা, তোমার মাথায় কী হয়েছে?’

বীরেনদা দু-পা এগিয়ে এসে, তার পিঠ চাপড়ে হেসে বললে, ও কিছু নয় ভাই, সব কথা পরে বলব।’

আমি বললুম, কিন্তু এরা আমাদের টেনে তুললে কেন? খুন করবার জন্যে?

—‘এ প্রশ্নেরও উত্তর পরে পাবে।'

—কিন্তু এরা আমাদের নিয়ে যা খুশি করুক, আপাতত আমাদের একটু জল দিক– তেষ্টা আর সইতে পারছি না। মরতে হয় তো, দানাপানি খেয়ে একটু জিরিয়েই মরব!’

বীরেনদা ফিরে একটু গলা তুলে বললে, কিং-হিং! তোমরা কি আমার বন্ধুদের একটু জল দেবে না?’

একটা চিনেম্যান দলের একজনকে কী বললে–সে তখনই চলে গেল, বোধ হয় জল আনতেই।

আমি সবিস্ময়ে বললুম, হ্যাঁ বীরেনদা, তোমার বাংলা কথা এরা বুঝতে পারলে?

বীরেনদা কোনও জবাব না দিয়ে একদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, চারজন চিনেম্যান একটা বড়ো ভারী পিপে তোলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

বীরেনদা মৃদুস্বরে বললে, সরল! অমিয়! তোমরা দুজনে ওই লোকগুলোকে সরিয়ে পিপেটাকে উপরে তুলে রেখে এসো তো!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন বীরেনদা?

—"ওদের এই সুযোগে দেখিয়ে দাও তোমাদের গায়ের জোরটা। তাহলে তোমাদের উপরে এদের শ্রদ্ধা বাড়বে—কারণ এ-সব লোক শ্রদ্ধা করে শুধু শক্তিকেই।'

আমরা এগিয়ে গেলুম। যে-চারজন লোক পিপেটাকে নিয়ে টানাটানি করছিল, বারংবার বিফল চেষ্টার পর তারা তখন পিপে ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল।

আমরা দুজনে পিপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইশারায় জিজ্ঞাসা করলুম, পিপেটাকে কোথায় তুলে রাখতে হবে?

লোকগুলো বিরক্তি-ভরা মুখভঙ্গি করে আমাদের পানে হিংস্র চোখ তুলে তাকালে, একটা লোক অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাশের একটা উঁচু জায়গা দেখিয়ে দিলে।

আমি আর অমিয় খুব সহজভাবে ও অনায়াসেই পিপেটাকে তুলে যথাস্থানে স্থাপন করলুম।

চারিদিকে বিজাতীয় ভাষায় অস্ফুট ধ্বনি উঠল। বোধ হয় সকলে আমাদের বাহবা দিচ্ছিল, কারণ ফিরে দেখি, সকলেরই বিস্ময় ও সম্ভ্রম ভরা দৃষ্টি আমাদের দিকে আকৃষ্ট। বীরেনদা বললে, 'এখন এদের কাছে তোমাদের প্রেস্টিজ অনেক বেড়ে গেল। ভবিষ্যতে তোমাদের সঙ্গে লাগবার আগে এরা ভাববে। ..ওই নাও, তোমাদের জল এসেছে।'

আমরা দুজনে সাগ্রহে গেলাসের পর গেলাস ভরে জলপান করলুম। জল যে এত মিষ্টি লাগে, এর আগে তা জানতুম না!

বীরেনদা চেচিয়ে বললে, কিং হিং! এখন তোমাদের সর্দার আমাদের নিয়ে কী করতে চান?"

কং হিং হচ্ছে একজন আধবুড়ো লোক, একমাত্র তারই মাথায় চিনাদের সেই বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতন পুরাতন ও সুদীর্ঘ টিকি, কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো জড়ানো রয়েছে। বীরেনদার কথা শুনে কং হিং তার পাশ্ববর্তী একটা চিনেম্যানের কানে কানে কী বললে।

বীরেনদা চুপি চুপি বললে, কিং হিং যার সঙ্গে কথা কইছে, ওই হচ্ছে বোম্বেটেদের সর্দার। ওর নাম চ্যাং-চুং-চ্যাং।'

চ্যাং একটা পিপের উপরে বসেছিল, কংহিং ছাড়া আর সব বোম্বেটেই তার কাছ থেকে সসন্ত্রমে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। চ্যাং বয়সে চল্লিশের কাছাকাছি–দেহেও খুব প্রকাণ্ড। দেহ দেখলেই বোঝা যায়, তার গায়ে বুনো মহিষের মতন শক্তি আছে। পরে শুনেছি, কেবল চাতুর্যের জন্যে নয়, সে সর্দার হতে পেরেছে তার আসুরিক গায়ের জোরেই। চ্যাঙের ডান চোখ কানা। ডান চোখের ঠিক উপরেই কপালে একটা কাটা দাগ দেখে আন্দাজ করলুম, কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামাতেই চোখটি সে খুইয়েছে। চিনেদের প্রায়ই গোঁফ থাকে না, চ্যাঙের কিন্তু গোফ আছে। আর সে গোঁফের মতন গোঁফই বটে, কারণ সেই গোঁফজোড়া একেবারে তার বুকের উপর পর্যন্ত গলদাচিংড়ির দুটো বড়ো বড়ো দাঁড়ার মতন ঝুলে পড়েছে। ডান হাতে লম্বা একটা চণ্ডুর পাইপ নিয়ে চ্যাং কথা কইতে কইতে সোঁ সোঁ করে ধোঁয়া টানছিল আর ছাড়ছিল। তার সেই কাটা কপাল, সেই কানা চোখের গর্ত, সেই জাঁদরেলি গোঁফ আর সেই বিরাট দেহ দেখলে মনের ভিতরে সত্য-সত্যই একটা বিভীষিকার ভাব জেগে ওঠে। মনে হয় এ লোক কারুর কাছে কখনও দয়া চায়নি, কারুকে কখনও দয়াও করেনি!

কং হিং দু-পা এগিয়ে এসে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'নীলগোলাপের ছাপ! নীলগোলাপের ছাপ! বাবু, তোমাদের নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে!'

বীরেনদার দিকে চেয়ে দেখলুম, সে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোট কামড়ে ধরল, তারপর একটা মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, 'নাঃ, তা ছাড়া আর উপায় নেই!'

আমি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, নীলগোলাপের ছাপ কী বীরেনদা?

—"আমাদের হাতে বোম্বেটেদের দলের চিহ্ন দেগে দেবে। এরপর আমরা যত দিন বাঁচব–এই অপমানের ছবি আমাদের হাতের ওপরে আঁকা থাকবে। এ ছবি দেখলে লোকে আমাদের বোম্বেটে জেনে ঘৃণায় দূরে সরে যাবে!

–কিন্তু এ ছবি যদি আমরা হাতের ওপর আঁকতে না দি?

—"তাহলে এখনই আমাদের মরতে হবে।'

অমিয় বললে, 'বোম্বেটে হব? তার চেয়ে এখনই পৃথিবী থেকে গোটাকয়েক বোম্বেটে কমিয়ে সমুদ্রে বাপ দেওয়া উচিত নয় কি?'

বীরেনদা বললে, 'না অমিয়, আমরা যে বোম্বেটে হব না, এটা একেবারে ঠিক কথা।'

—তবে এই চিহ্ন আমাদের হাতে দেগে দেবে কেন?

—'ওরা অবশ্য জানবে যে, আমরা ওদেরই দলের লোক। কিন্তু আমরা যে ওদের লোক কখনোই হব না, সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই! আর ওদেরও সেই সন্দেহ আছে বলেই আমাদের ওরা একেবারে মার্কামারা করে ছেড়ে দিতে চায়।'

—"কিন্তু আমাদের দলে নেবার জন্যে ওদের এতটা উৎসাহ কেন?'

—"ওদের উৎসাহ কেন? আমার সব কথা শুনলেই পরে তোমরা বুঝতে পারবে। ওই নীলগোলাপের ছাপ আমাদের হাতের ওপরে দেগে দিয়ে ওরা আমাদের বেঁধে রাখতে চায়! কারণ এর পরেও আমরা যদি ওদের বিশ্বাসঘাতকতা করি, তাহলে ওরাও আমাদের ধরিয়ে দিতে পারবে। এই বিখ্যাত নীলগোলাপের ছাপ সব দেশের পুলিশই চেনে। যারই হাতে এই ছাপ থাকে তারই একমাত্র দণ্ড হচ্ছে প্রাণদণ্ড ।...এখন প্রস্তুত হও। ওই দ্যাখো, ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এইবার আমাদের নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে–'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'অর্থাৎ এইবার আমাদের বোম্বেটে হতে হবে?'

‘মানোয়ারি’ জাহাজ

হাতের ওপরে আমরা নীলগোলাপের ছাপ নিয়েছি!—একটা মড়ার মাথার উপরে গোলাপ ফুটে আছে–সমস্তটাই নীল রঙের উলকিতে আঁকা! এ ছাপ আমাদের হাতে দেখলে সাধুরা ভয়ে পালিয়ে যাবে, পুলিশ আমাদের পিছনে তাড়া করবে!

চোখের সামনে ফাসিকাঠের স্বপ্ন দেখতে দেখতে নিজেদের কামরায় ফিরে এলুম।

অমিয় প্রথমেই বললে, বীরেনদা, আগে তোমার গল্‌প শুনব।

বীরেনদা যা বললে, তা হচ্ছে এই –ভাই, অতক্ষণ পানাহার না করে জলের ভিতরে ভাসতে ভাসতে আমার সর্বশরীর যে নেতিয়ে পড়েছিল, সে-কথা স্বীকার না করলে মিথ্যা কথা বলা হবে। সত্যিই আমার ভারী কষ্ট হচ্ছিল!..কিন্তু সে-কষ্টও আমাকে তত ব্যথা দিচ্ছিল না, যত ব্যথা পাচ্ছিলুম তোমাদের কাতরানি আর ছটফটানি দেখে। একে তো তোমাদের আমি ভাইয়ের মতন ভালোবাসি, তার উপরে আমার পরামর্শ শুনেই তোমরা প্রাণ দিতে বসেছ। কাজেই যাতনায় আর অনুতাপে প্রাণ আমার ফেটে যাবার মতো হল। মনে মনে পণ করলুম, প্রাণ তো যেতেই বসেছে, তবু তোমাদের জন্যে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। তাই তোমাদের ভরসা দিয়ে আমি কাছি ধরে আবার জাহাজের উপরে গিয়ে উঠলুম।

কিন্তু চেষ্টা করেও কিছু যে ফল হবে, সে আশা আমার ছিল না মোটেই। তবু ডুবে মরবার সময়ে মানুষ খড়ের কুটোও জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে–আমার এ চেষ্টাও অনেকটা তারই মতো। মরব যখন নিশ্চয়ই,

মরার ভয়ও ছিল না! তখন আমি মরিয়া। পাগলা হাতির সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি অনায়াসে। মনে মনেই বললুম, এখন আমার সুমুখে যে এসে দাঁড়াবে নিতান্তই তাকে যমে টেনেছে!'

জাহাজের কোন ঘরে খাবার জল থাকে, তা আমি জানতুম। রাতও হয়েছে, শত্রুরও ভয় নেই। সুতরাং বোম্বেটেরা হয়তো এখন যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে, এমনি একটা আন্দাজও আমি করে নিলুম।

'পা টিপে টিপে গুড়ি মেরে এগুতে লাগলুম' ,—জীবনে এত নিঃশব্দে আর কখনও আমি অগ্রসর হইনি। চোখের উপরে ভেসে উঠছে বারংবার তোমাদের কাতর মুখ এবং বারংবার মনে হচ্ছে, তোমাদের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে আমার সফলতার উপরেই। ...আজ যদি খাবার আর জল জোগাড় করতে পারি, তাহলে আমাদের সকলেরই প্রাণ বাঁচবে। তারপর জাহাজ কোনও বন্দরে গিয়ে লাগলেই আমরা ডাঙায় উঠে সরে পড়তে পারব।

জাহাজের ভাঁড়ার ঘরের কাছে এসে পড়লুম, কেউ আমাকে দেখতে পেলে না। আসতে আসতে অনেক কামরার ভিতর থেকেই শুনতে পেলুম, মানুষের নাকডাকার আওয়াজ!

'কিন্তু ভাঁড়ার ঘরের সামনে গিয়েই দেখলুম, একটা লোক দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে ঘুমোচ্ছে না বটে, কিন্তু ঢুলছে। নিশ্চয়ই প্রহরী!

জাহাজের মেঝের উপর শুয়ে পড়লুম। তারপর ধীরে ধীরে এগুতে লাগলুম, সাপের মতন বুকে হেঁটে।

'প্রায় যখন তার কাছে গিয়ে পড়েছি, হঠাৎ সে অকারণেই মুখ তুললে; এবং চোখ খুললে; এবং বলা বাহুল্য, আমাকে দেখতেও পেলে!

'একলাফে সে দাঁড়িয়ে উঠল—একলাফে আমিও দাঁড়িয়ে উঠলুম। সে নিজেকে সামলাবার আগেই দুই হাতে প্রাণপণে তাকে জড়িয়ে ধরলুম। লোকটা বিকট আর্তনাদ করে উঠল— সেই তার শেষ আর্তনাদ। কারণ পর-মুহুর্তেই আমি নিজেই শুনতে পেলুম, আমার হাতের চাপে তার ঘাড়ের, পাজরার আর হাতের হাড় মড়মড় করে ভাঙতে শুরু করল। তার গলা দিয়ে আর একটি টু শব্দও বেরুল না! লোকটাকে এমন ভাবে খুন করতে আমার মনে একটুও দরদ জাগল না—এ সেই বোম্বেটেদেরই একজন, যারা কাল রাতে জাহাজের সমস্ত নিরীহ যাত্রীকে হত্যা করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছে। না পালালে আমরাও এতক্ষণ বেঁচে থাকতুম না।

চারিদিকে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শুনে সেই হাড়গোড়-ভাঙা মড়াটাকে ছুড়ে ফেলে দিলুম। তখন পালাবার উপায়ও ছিল না, পালাবার ইচ্ছাও রইল না। যে উদ্দেশ্যে এসেছি, তাও বিফল হল—মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী, তা এদের হাতেই হোক, আর অনাহারে বা জলে ডুবেই হোক!

'আমি বক্সিং জানি, যুযুৎসু জানি। আর আমার গায়ে কী-রকম জোর আছে, কলকাতার পথে একদিন এক খ্যাপা মোষের সঙ্গে লড়বার সময়েই তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ। তার উপরে বলেছি তো আজ আমি মরিয়া আর বেপরোয়া! সুতরাং তারপরেই জাহাজে যে ব্যাপারটা ঘটল, আমার মুখে শুনলে তোমরা ছাড়া আর কেউ বোধ হয় তা বিশ্বাস করতে চাইবে না। তবে মুষ্টি যোদ্ধা আর যুযুৎসু-র পালোয়ানরা হয়তো আমার কথা অত্যুক্তি বলে মনে করবেন না।*

---

*বীরেনদার এ অনুমান সত্য। কারণ বছর পয়ত্রিশ আগে কলকাতায় চৌরঙ্গির উপরে, একবার এক যুযুৎসু-র পালোয়ান খালি হাতে একাকী উনিশ-বিশ জন লোককে হারিয়ে দিয়েছিল। সে সময়ে ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজে ওই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। যাঁদের সন্দেহ হবে, তারা উক্ত ইংরেজি সংবাদপত্রের পুরানো ফাইল খুলে দেখতে পারেন। ইতি—লেখক।

একসঙ্গে কত লোক যে আমাকে আক্রমণ করলে, তা আমি বুঝতে পারলুম না। তবে বিশ-পঁচিশ জনের কম নয় নিশ্চয়ই!

কিন্তু তারা আমাকে ধরতে পারলে না—আমি তাদের সে সুযোগ দিলুম না। বিদ্যুতের মতন বেগে আমি একবার বায়ে, একবার ডাইনে,—একবার সুমুখে, আর-একবার পিছনে লাফিয়ে বা গুড়ি মেরে সরে সরে যেতে লাগলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত চলতে লাগল ক্ষিপ্রগতিতে এমন কৌশলে যে, খানিকক্ষণ পর্যন্ত তারা তো আমাকে ধরতে পারলে না বটেই, উলটে তাদের দলের আট-দশ জন লোক আহত বা অজ্ঞান হয়ে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ল এবং অনেকেই মার খেয়ে আর্তনাদ করতে করতে পিছিয়ে গেল!

‘ক্রমেই তাদের দলে লোক বাড়তে লাগল এবং আমিও হাঁপিয়ে পড়লুম। আর বেশিক্ষণ এমন অসমান লড়াই নিশ্চয়ই আমি চালাতে পারতুম না,—কিন্তু বোম্বেটেরা আমার শক্তি দেখে অবাক হয়ে নিজেরাই দূরে সরে গিয়ে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল!

‘এবং সেই অবসরে আমি পিঠ থেকে বন্দুকটা খুলে নিয়ে ডান হাতে লাঠির মতো বাগিয়ে ধরে, আর বাঁ-হাতে রিভলভারটা বার করে বোম্বেটেদের দিকে তুলে ইংরেজিতে চেঁচিয়ে বললুম, দেখছ, গায়ের জোরেও আমি শিশু নই, আর আমার হাতে অস্ত্রেরও অভাব নেই! যদি মরবার সাধ থাকে, তবে এগিয়ে এসো!

'বোম্বেটেদরে মধ্য হতে একটা ভয়ের কানাকানি উঠল,—এগুবে কী, তারা আরও পিছনে হটে গেল!

‘আচম্বিতে একটা লোক ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ‘তুমি কি বীরুবাবু?’

‘এমন জায়গায় একটা চিনে-বোম্বেটের মুখে হঠাৎ বাংলা কথা আর– তার চেয়েও যা অসম্ভব–আমার নাম শুনে আমি তো একেবারে থ হয়ে গেলুম!

‘তখন জাহাজের চারিদিকে অনেক আলো জ্বলে উঠেছিল। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে, ভালো করে চেয়ে দেখেই লোকটাকে চিনতে পারলুম। তার নাম কং হিং, কলকাতায় অনেক দিন ধরে একটা জুতোর দোকান চালিয়েছিল। সর্বদাই সে হাসত–তার মুখের হাসি কখনও শুকোতে দেখিনি। ছেলেবেলা থেকেই ফি বছরে তার দোকানে গিয়ে আমি অনেক জুতো কিনেছি। তার দোকানের জুতো নইলে আমার পছন্দ হত না। সে বেশ বাংলা জানত আর আমার সঙ্গে তার খুব জানাশোনাও ছিল। কিন্তু আজ থেকে বছর-দুই আগে সে দোকানপাট তুলে কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়েছিল। তারপর আজ হঠাৎ তার দেখা পেলুম অপার সাগরের ভিতরে, এই বোম্বেটেদের দল।

'আমি বললুম, 'আরে, কং হিংসায়েব যে! তাহলে আজকাল দেখছি জুতোসেলাই ছেড়ে তুমি মানুষের গলাকাটা ব্যাবসা শুরু করেছ? বেশ, বেশ! কিন্তু দেখছ, আমার গলা কাটা কত শক্ত?'

কিং হিং হা হা করে হেসে উঠল এবং তার হাসি নীরব হবার আগেই ভিড় ঠেলতে ঠেলতে আর-একজন লম্বা-চওড়া জোয়ান বাইরে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ তাকে দলের ভিতরে দেখিনি, সে বোধ হয় কামরার ভিতরেই ছিল। পরে শুনলুম তার নাম চ্যাং-চুংচ্যাং–বোম্বেটেদের সর্দার।

'যে-লোকগুলো জখম হয়ে চারিদিকে গড়াগড়ি দিচ্ছিল তাদের উপরে এক চক্ষু বুলিয়ে, চ্যাং বিস্মিত ভাবে অল্পক্ষণ আমার পানে মিটির মিটির করে চেয়ে রইল। তারপর কং হিংয়ের দিকে ফিরে খোনা গোলায় কী যেন জিজ্ঞাসা করলে।

কং হিং চিনে ভাষায় তাকে কী বলতে লাগল আর চ্যাংও তাই শুনতে শুনতে বার বার প্রশংসা-ভরা চক্ষে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে আর নিজের বুক-পর্যন্ত-ঝুলেপড়া লম্বা গোঁফের উপরে হাত বুলোতে লাগল। কং হিংয়ের কথা শেষ হবার পর চ্যাং গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ কী ভাবলে। তারপর কং হিংকে আবার কী বললে।

'কং হিং আমার দিকে ফিরে বললে, বীরুবাবু, তুমি অস্ত্র নামাও। আমাদের সর্দার তোমার বীরত্ব দেখে ভারী খুশি হয়েছেন।

'আমি বললুম, কিন্তু তোমাদের কথায় বিশ্বাস কী? আমি অস্ত্র নামালে তোমরা যদি আবার আমাকে আক্রমণ করো?'

কং হিং হেসে বললে, বীরুবাবু, আমরা ইচ্ছে করলে কি তোমাকে এখনও মেরে ফেলতে পারি না? আমাদের লোকেরা তাড়াতাড়িতে শুধু হাতে

বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তারা যদি এখন সবাই মিলে বন্দুক নিয়ে এসে ফের তোমাকে আক্রমণ করে–'

'বাধা দিয়ে বললুম, কিন্তু তার আগেই আমিও যে এখনই তোমাদের সর্দারকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারি।.তবে ঝগড়ার কথা থাক। আমি অস্ত্র রাখছি, তুমি কী বলতে চাও, বলো।'

কিং হিং আমার কাছে এসে বললে, বীরুবাবু, খালি বীরত্বের জন্যে নয়, আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ছিল বলেই এ যাত্রা তুমি বেঁচে গেলে! আমি হচ্ছি চ্যাংয়ের দাদা। চ্যাং সর্দার হলেও আমাকে মান্য করে। আজ থেকে তুমিও আমাদের দলের একজন হলে–তোমার মতন লোক পেলে আমাদের অনেক উপকার হবে। কেমন, তুমি রাজি আছ তো?"

ভাবলুম, বলি, না!—ভদ্রলোকের ছেলে, বোম্বেটে হব?—কিন্তু তারপরেই মনে হল শঠের সঙ্গে শঠতা করতে দোষ কী? আপাতত তাদের কথায় রাজি হয়ে প্রাণ বাঁচাই তো, তারপর সুবিধা পেলেই চম্পট দেওয়া যাবে।

'চালাক কং হিং হাসতে হাসতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের ভাব লক্ষ করছিল। আমার মনের কথা সে বোধ হয় কতকটা আন্দাজ করতে পারলে। কারণ সে বললে, 'হ্যাঁ বীরুবাবু, আর এক কথা। আমাদের দলে এলে তোমাকে নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে।'

'আমি জিজ্ঞাসা করলুম, সে আবার কী?

—"আমাদের দলের চিহ্ন। এ চিহ্ন তোমার হাত থেকে কখনও উঠবে না। এ চিহ্ন হাতে থাকলে আমাদের দলের লোক আর বিশ্বাসঘাতকতা করে ফাঁকি দিতে পারে না। কারণ দল ছাড়লেই তারা

পুলিশের হাতে গিয়ে পড়ে–অর্থাৎ আমরাই তাকে ধরিয়ে দিই। পুলিশও যার হাতে ওই চিহ্ন দেখে, তার কোনও কথা বিশ্বাস করে না।'

কিন্তু তখন আমি মন স্থির করে ফেলেছি, কং হিংয়ের এই ভীষণ কথা শুনেও নিশ্চিন্ত ভাবে বললুম, আমি তোমাদের কথায় রাজি আছি–যদি আমার আরও দুজন সঙ্গীকেও তোমাদের দলে নাও '

কং হিং বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'তোমার আরও দুজন সঙ্গী! কোথায় তারা?"

'আমি তাকে আমাদের সকলকার সব কথা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলুম। 'কং হিং চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, তবেই তো! সর্দার বোধ হয় রাজি হবে না।'

আমি বললুম, কিং হিং সায়েব, আমার বন্ধুদেরও পেলে তোমাদের দলের জোর বাড়বে। তাদের গায়েও জোর বড়ো কম নয়! আর তাদের যদি দলে না নাও, আমাকেও তোমরা পাবে না। তাহলে আমরা তিনজনেই তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মরব, মরতে আমরা কেউ ভয় পাই না। বলো, তাহলে আমার বন্ধুদের ডাকি, আর ফের অস্ত্র ধরি?

'মাথার উপরে পাকানো টিকি-খোপার উপরে হাত বুলোতে বুলোতে কং হিং আবার চ্যাঙের কাছে ফিরে গেল, আবার তাদের দুজনের ভিতরে কী পরামর্শ হল। তারপর কং হিং আবার আমার কাছে হাসিমুখে ফিরে এসে বললে, আমার এই পয়মন্ত টিকির জয় হোক। আজ দেখছি তোমাদের অদৃষ্ট খুব ভালো। সর্দারকে রাজি করেছি।

সরল, অমিয়, তারপরের কথা সব তোমরা জানো! বীরেনদীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে বিষম একটা হইচই উঠল! চমকে চেয়ে

দেখি, ইতিমধ্যে কখন রাত পুইয়ে গেছে আমরা কেউ তা খেয়ালে আনিনি–জানালা দিয়ে নীলাকাশ থেকে ঝরে পড়া সকালের সাদা আলো কামরার ভিতরটা পর্যন্ত উজ্জ্বল করে তুলেছে এবং বাইরে বোম্বেটেরা ব্যস্তভাবে চিৎকার আর ছুটোছুটি করছে।

ব্যাপার কী জানবার জন্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। দেখলুম, চ্যাং আর কং হিং দূরবিন চোখে দিয়ে যেদিক থেকে সূর্যোদয় হচ্ছে সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কাঠের পুতুলের মতো নিস্পন্দ হয়ে।

বীরেনদা শুধোলে, এত সকালে দূরবিন চোখে দিয়ে কী দেখছ কং হিং সায়েব?

দূরবিনটা চোখ থেকে নামিয়ে কং হিং হাসিমুখেই বললে, মানোয়ারি জাহাজ!

—'মানোয়ারি জাহাজ?

—'হ্যাঁ বীরুবাবু! ও জাহাজে গোলা আছে, কামান আছে। ওরা আমাদেরই ধরতে আসছে!'

তিন-পাহাড়ি দ্বীপ

মানোয়ারি জাহাজ আসছে আমাদের আক্রমণ করতে?

কথাটা শুনে সুখী হব, কি দুঃখিত হব, আমি তা বুঝতে পারলুম না—অবাক হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলুম, হুস হুস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একখানা জাহাজ ক্রমেই দেখতে বড়ো হয়ে উঠছে!

অমিয় খুশিমুখে বললে, এইবার আমরা মুক্তি পাব।

আমি বললুম, আমরা মুক্তি পাব না অমিয়! আমাদের বিপদ বরং আরও বেড়ে উঠল!

—'কেন সরলদা, আমাদের আবার বিপদ কীসের? আমরা তো আর বোম্বেটে নই!'

—কিন্তু আমাদের হাতে যে নীলগোলাপের মার্কা মারা আছে! আমরা যে বোম্বেটে নই, ওরা তা বিশ্বাস করবে কেন?

—আমরা সব কথা খুলে বলব, আমরা–'

বাধা দিয়ে বললুম, সে আর হয় না অমিয়! এই বোম্বেটদের সঙ্গে ধরা পড়লে আমাদের আর কিছুতেই বাঁচোয়া নেই!'

অমিয়ের খুশিমুখ আবার স্নান হয়ে পড়ল। সে বোম্বেটের মতন মরতে চায় না। এমন সময়ে চ্যাং চোখ থেকে দূরবিন নামিয়ে চিনে-ভাষায় চেঁচিয়ে কী-একটা হুকুম দিলে।

ডেকের উপর কলরব তুলে বোম্বেটেরা চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। এবং দেখতে দেখতে আমাদের জাহাজের গতি বেড়ে উঠল!

কং হিং আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। মাথার টিকির কুণ্ডলীর উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, বীরুবাবু, তোমার মনে বোধ হয় খুব ভয় হয়েছে?

বীরেনদা বললে, 'হ্যাঁ, ভয় হচ্ছে বটে,—তবে প্রাণের ভয় নয়, অপমানের ভয়!

—তার মানে?

—আমরা বোম্বেটে না হয়েও বোম্বেটে বলে ধরা পড়ব, এটা কি আমাদের পক্ষে অপমানের কথা নয় কং হিং?'

—আমরা ধরা পড়ব কেন বীরুবাবু?

—আমরা যে ধরা পড়ব না কেন, তারও তো কোনও কারণ দেখছি না। আমাদের পিছু নিয়েছে মানোয়ারি জাহাজ–আমাদের জাহাজের চেয়ে সে ঢের বেশি তাড়াতাড়ি এগুতে পারে। সুতরাং তাকে এড়িয়ে আমরা পালাতে পারব না। তারপর মানোয়ারি জাহাজে আছে দলে দলে গোরা, অগুনতি বন্দুক আর কামান! সুতরাং লড়াই করেও তার সঙ্গে আমরা এটে উঠতে পারব না।'

কং হিং হেসে বললে, তোমাদের কথা ঠিক বীরুবাবু। মানোয়ারি জাহাজ আমাদের পক্ষে যমের মতোই বটে। কিন্তু তবু আমরা তাকে কলা দেখিয়ে পালাতে পারব। এদিকে এসে দেখে যাও–এই বলে সে বীরেনদীকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল, আমরা দুজনেও তাদের পিছনে পিছনে অগ্রসর হলুম।

এতক্ষণ আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, সেখান থেকে জাহাজের অন্য পাশের সমুদ্রের দৃশ্য কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এখন এপাশে এসে দাঁড়িয়ে

দেখি, এ কী অভাবিত ব্যাপার! আমাদের চোখের সামনে, মাইল-কয়েক দূরে জেগে উঠেছে একটি পরমসুন্দর অরণ্যশ্যামল দ্বীপের ছবি—তার মাথার উপরে আকাশের নীলপটে আঁকা রয়েছে পাশাপাশি তিনটি পাহাড়ের ধূসর চুড়া!

দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—মনে হল এই বিপদসঙ্কুল পাথরে সেই-ই যেন আমাদের একমাত্র মুক্তির নীড়!

কং হিং হাসতে হাসতে বললে, ‘এখন বুঝছ তো বীরুবাবু, কেন আমরা ধরা পড়ব না? একবার ওই দ্বীপে গিয়ে উঠতে পারলে আর আমাদের হাতে পায় কে?

আমি বললুম, কিন্তু কং হিং সায়েব, জাহাজ গোরারাও যে দ্বীপে উঠে আমাদের আক্রমণ করবে না, এতটা ভরসা তুমি করছ কেন?

—‘কী, দ্বীপে উঠে আমাদের আক্রমণ করবে? অসম্ভব, অসম্ভব! ওখানকার এমন সব লুকোবার জায়গা আমরা জানি যে, কেউ আমাদের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাবে না।.জানো বীরুবাবু, ওই দ্বীপে আসবার জন্যেই আমরা এই জাহাজ লুট করেছি?

বীরেনদা একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, ‘কেন, ওই দ্বীপে আসবার জন্যে তোমাদের এতটা আগ্রহের কারণ কী?

কং হিঙের দুই চোখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বললে, কারণ কী? কারণ—না, না, কোনোই কারণ নেই—দেখিগে, ওদিককার ব্যাপারখানা?—বলেই দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

কং হিঙের কথায় কেমন যেন রহস্যের আভাস পাওয়া গেল। ওই দ্বীপেই ওরা যেতে চায়? ওইখানে যাবার জন্যেই ওরা এই জাহাজ লুট

করেছে? এর একটা গুপ্ত কারণ আছে নিশ্চয়ই, অথচ সে কারণটা যে কী কং হিং তা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে রাজি নয়! আমাদের জাহাজ উর্ধ্বশ্বাসে দ্বীপের দিকে ছুটতে লাগল, দ্বীপের গাছপালা হয়ে উঠল ক্রমেই স্পষ্ট।

ওধারে গিয়ে দেখি, মানোয়ারি জাহাজখানা আরও কাছে এসে পড়েছে—দু-পাশে সমুদ্রের জল ফেনিয়ে তুলে।

ওধারে চেয়ে দেখলুম, চ্যাং, কং হিং আর জনকয়েক চিনেম্যান একখানা কাগজের উপরে ঝুঁকে পড়ে ব্যস্তভাবে কী দেখছে আর পরামর্শ করছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারলুম, কাগজখানা হচ্ছে দ্বীপের ম্যাপ!

জাহাজেরও চারিদিকে মহা হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক ক্রমাগত চিৎকার আর ছুটোছুটি করছে, কেবিন থেকে জিনিসপত্তর বাইরে টেনে আনছে, মোটমাট বাঁধছে। এসব যে জাহাজ ছেড়ে পালাবার উদ্যোগ, তা আর বুঝতে বিলম্ব হল না।

আচম্বিতে গুড়ুম করে একটা শব্দ হল! চমকে চেয়ে দেখি, মানোয়ারি জাহাজ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোয়া উঠছে এবং একটা অগ্নিময় পিণ্ড আমাদের মাথার উপর দিয়ে হু হু করে চলে যাচ্ছে! গোরারা তোপ দাগছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, আমরা দ্বীপের দিকে পালাচ্ছি।

দ্বীপ তখন আমাদের কাছ থেকে মাইল-দুয়েক তফাতে।

বোম্বেটেরা এদিকে-ওদিকে লুকিয়ে পড়ল, জাহাজের ডেকের উপরে দাঁড়িয়ে রইলুম খালি আমরা তিন বন্ধু, আর রইল চ্যাং, কং হিং আর তিনজন চিনেম্যান।

আবার গুড়ুম করে আওয়াজ, কিন্তু এবারের গোলাটাও লক্ষচ্যুত হয়ে আমাদের জাহাজের পাশ ঘেঁষে চলে গেল।

বীরেনদা বললে, 'গতিক বড়ো সুবিধের নয়! চলো, এই বেলা কেবিনে গিয়ে জিনিসপত্তরগুলো বেঁধে-ছেঁদে নি। বিপদ দেখলে আবার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে।

কেবিনের ভিতরে যখন ঢুকছি, তখন মানোয়ারি জাহাজ থেকে একসঙ্গে দুটো কামান গর্জে উঠল! তারপরেই আমাদের জাহাজখানা কেঁপে উঠল এবং শব্দ শুনেই বুঝলুম, এবারের গোলা আর লক্ষ্যচ্যুত হয়নি!

মানুষের চেঁচামেচি আর কাতরানি শুনেই বোঝা যেতে লাগল, মরণের আসন্ন আলিঙ্গন আমাদের চারপাশ ঘিরে এগিয়ে আসছে!

মোটমাট নিয়ে উপরে এসে দেখলুম, ভীষণ দৃশ্য! আমাদের জাহাজ আর চলছে না, গোলার চোটে তার ধোঁয়া ছাড়বার চোঙাদুটো উড়ে গেছে, তার ইঞ্জিন বন্ধ, তার সর্বাঙ্গ ভগ্নচুর্ণ এবং ডেকের উপরে রক্তের ঢেউ বইয়ে কয়েকটা মানুষের মৃতদেহ নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে–কোথাও জ্যান্ত মানুষের চিহ্ন নেই।

মানোয়ারি জাহাজের তোপ তখনও ধোঁয়া আর আগুন উদগার করছে। জাহাজের ওপাশে ছুটে গেলুম–কেউ কোথাও নেই! হঠাৎ অমিয় সমুদ্রের দিকে আঙুল তুলে বললে, দ্যাখো, দ্যাখো! সমুদ্রের বুকে দু-খানা বড়ো বড়ো বোট ভাসছে–তার ভিতরে ঠেসাঠেসি করে বসে আছে অনেকগুলো লোক! বোট দু-খানা ছুটেছে দ্বীপের দিকেই।

বীরেনদা বললে, "বোম্বেটেরা পালাচ্ছে!'

আমি বললুম, কিন্তু আমাদের উপায় কী? আসল বোম্বেটেরা তো পালাল, শেষটা ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠে চড়ব আমরাই নাকি?—আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই মানোয়ারি জাহাজের একটা গোলা আমাদের জাহাজ ডিঙিয়ে পড়ল গিয়ে বোম্বেটেদের একখানা বোটের উপরে!

বোটখানা তখনই ভেঙে দু-খানা হয়ে গেল–মানুষগুলোও কে কোথায় ছিটকে পড়ল, কিছুই বুঝতে পারলুম না–কেবল শুনতে পেলুম একটা মর্মভেদী হাহাকারের একতান হা হা করে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই সীমাহারা সাগরের মাঝখানে কোথায় হারিয়ে গেল–অসহায়ের মতো!— তেমন ভয়ানক কান্না আমি আর কখনও শুনিনি, আমার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল!..হয়তো ও-নৌকোর জনপ্রাণীও আর বেঁচে নেই!

অন্য বোটের বোম্বেটের প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল।

অমিয় বললে, যেমন কর্ম তেমনি ফল! চ্যাঙের গোঁফ আর কং হিংঙের টিকি কোন বোটে উঠেছে, তাই ভাবছি।'

ইতিমধ্যে বীরেনদা কোথা থেকে তিনটে জীবন-রক্ষক-জামা সংগ্রহ করে আনলে! এই জামা পরলে মানুষ জলে ডোবে না।

তাড়াতাড়ি পরামর্শ করে আমরা তিনটে পিপে এনে তার ভিতরে আমাদের দরকারি জিনিসপত্তর পুরে, পিপেগুলোর মুখ এমন ভাবে বন্ধ করে দিলুম, যাতে ভিতরে জল ঢুকবার পথ না থাকে। তারপর পিপে তিনটেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললুম। স্থির হল, এই পিপেগুলোকে সমুদ্রে ফেলে আমরাও জলে ঝাঁপ দেব। তারপর ভাসতে ভাসতে দড়ি ধরে পিপেগুলোকে টানতে টানতে দ্বীপে গিয়ে উঠব।

দ্বীপ এখন মাইলখানেক তফাতে রয়েছে। তার তিন পাহাড়ের তলায় এমন নিবিড় অরণ্য স্থির হয়ে আছে যে, ভিতরের আর কোনও দৃশ্য দেখবার উপায় নেই।

বীরেনদা গম্ভীর ভাবে বললে, 'কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে যেন ওই রহস্যময় অজানা দ্বীপের ভিতরে হাজার হাজার বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে! চ্যাঙের দল ওই দ্বীপে যাবার জন্যেই এই জাহাজখানা দখল করেছিল। দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে ওখানেই যাবার জন্যে তাদের যখন এমন আগ্রহ, তখন ভিতরে নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে। কিন্তু তাদের গুপ্তকথা তো জানা গেল না।'

অমিয় বললে, বীরেনদা সরলদা! আমাদের জাহাজ বোধ হয় ডুবে যাচ্ছে?

সত্যিই তাই! জাহাজখানা ক্রমেই কত হয়ে পড়ছে এবং তার লম্বালম্বি একটা দিক জলের ভিতর অনেকখানি নেমে গিয়েছে!

ওদিকে মানোয়ারি জাহাজখানা জল কাটতে কাটতে খুব কাছে এসে পড়েছে। তার ডেকের উপরে দলে দলে গোরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাও দেখতে পেলুম।

আর দেরি না! আমরা পিপে তিনটেকে দড়িতে ঝুলিয়ে জলে নামিয়ে দিলুম এবং নিজেরাও নেমে আবার সেই সমুদ্রকেই আশ্রয় করলুম। ভরসা শুধু এই, এবারে আর অকূল পাথারে ভাসছি না-কুল রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই জেগে স্বপ্নমায়ার মতন!

কিন্তু পিছনে রয়েছে জাহাজ গোরাদের সতর্ক দৃষ্টি বন্দুকের গুলি এড়িয়ে তীরে গিয়ে উঠতে পারব কি?

সে সময়ে আমাদের মনে যে ভাব লীলায়িত হচ্ছিল, কবিতার আকারে তা এই ভাবে বলা যায়–

ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,
ডাকছে সাগর পাগল-পারা!
ছুটছে গোলা, ছুটছে সাগর,
ছুটছে দেহের রক্তধারা!
বাংলা দেশের শ্যামলা ছেলে
চলছে আকাশ-বাতাস ঠেলে,
অবাক হয়ে দেখছে চেয়ে
সূর্য এবং চন্দ্র-তারা–
ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,

ডাকছে সাগর পাগল-পারা!
বাংলা দেশের শ্যামলা ছেলে
মরণ-খেলায় হয় না সারা,
মৃত্যু তাদের বক্ষে নাচে,
চক্ষে তাদের অগ্নি-ঝরা।
মরিই যদি মরব জেগে,
বাজের মতন ভীষণ বেগে!
শিশুর মতন মরছে তারা
ফুল-বিছানায় ঘুমোয় যারা–

ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,
ডাকছে সাগর পাগল-পারা।

আমরা যে চাই বৃহৎ মরণ!
–তা ছাড়া আর নেইকো চারা
কেঁচোর মতন কে হবে রে,
জুতোর চাপে জীবনহারা!
টবের গোলাপ হয়ে মোরা,
রইব না রে ঘরে পোরা,
ছোট্ট ঝড়ে মরব না তো
জড়িয়ে ধরে মাটির কারা–
ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,
ডাকছে সাগর পাগল-পারা।

অমানুষী দৃষ্টি

দ্বীপের দিকে ভাসতে ভাসতে চলেছি। গায়ে জীবনরক্ষক সেই জামা ছিল, কাজেই জলের উপরে ভেসে থাকবার জন্যে আমাদের কোনওরকম কষ্টই স্বীকার করতে হল না। প্রত্যেকেই এক-একটা পিপে পিছনে টানতে টানতে খুব সহজেই জল কেটে দ্বীপের দিকে এগিয়ে চললুম!

বোম্বেটেদের নৌকোখানা দ্বীপের খুব কাছেই গিয়ে পড়েছে। মানোয়ারি জাহাজের গোলা, এখনও তাদের পিছু ছাড়েনি বটে, কিন্তু এ যাত্রা আর তাদের ধরতে পারবে না বোধ হয়। মানোয়ারি জাহাজের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার উপর থেকেও একখানা বোট নামানো হচ্ছে। তাহলে গোরারাও সহজে ছাড়বে না দেখছি—তারাও বোধ হয় দ্বীপে আসবার বন্দোবস্ত করছে।

আমি বললুম, আরও শিগগির—আরও শিগগির সাঁতরে চলো, নইলে আমরাই আগে ধরা পড়ব!'

বীরেনদা বললে, 'ওঃ, এই নীলগোলাপের ছাপ! এর জন্যেই তো এত ভয়! নইলে কি এমন ভীরুর মতন আমরা পালাতুম?

অমিয় বললে, 'হ্যাঁ বীরেনদা, এমন করে পালাতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে!'

আমি বললুম, কিন্তু লজ্জা কীসের অমিয়? আমরা তো আজ প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছি না, আমরা পালাচ্ছি মানের দায়ে!

অমিয় বললে, ''আচ্ছা, গোরারা যদি আগে আমাদেরই ধরতে আসে?

আমি বললুম, আমরা ধরা দেব না। আমরা লড়াই করব–’

বীরেনদা বললে, ‘হ্যাঁ, পৃথিবী থেকে অন্তত গোটাকয় কটাচামড়ার মানুষ কমিয়ে তবে আমরা মরব, আমাদের এই কালোচামড়ার মর্যাদা আমরা নষ্ট করব না–কিছুতেই না?

আমি বললুম, কিন্তু বীরেনদা, ওরা যদি আমাদের বন্দি করে,—ওরা যদি আমাদের মরতে না দেয়?

বীরেনদা অট্টহাস্য করে বলে উঠল, 'মরতে দেবে না? যে মরতে চায়, তাকে মরতে দেবে না? যে বাঁচতে চায়, মৃত্যু তাকেও জোর করে টেনে নিয়ে যায়–

বাধা দিয়ে আমি বললুম, কিন্তু যে মরতে চায় মৃত্যু তাকে সহজে গ্রহণ করে না, এইটেই তো আমি নিত্যি দেখতে পাই!’

—মৃত্যু তো কাপুরুষকে গ্রহণ করে না সরল! দুনিয়ার সব আশা হারিয়ে, জীবনের দুঃখ এড়াবার জন্যে মরণকে যারা চায়, মৃত্যু যে তাদের ঘৃণা করে!.ওই দ্যাখো, মৃত্যু আমাদের দিকে ছুটে আসছে!’

অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ-সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারপাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে হাওয়া কেটে অনেকগুলো গুলি চলে গেল! গোরারা আমাদেরও দেখতে পেয়েছে!

অমিয় চিৎকার করে গেয়ে উঠল,

‘মরব, মরব, মরব মোরা,
মরতে মোরা ভালোবাসি!
মরণ-খেলা খেলতে সুখে
আমরা যে ভাই ধরায় আসি।

আয় রে ছুটে মাটির ছেলে,
কাপুরুষের ভাবনা ফেলে,
জীবন তোদের পোকার জীবন–
কাঁদন-ভরা তোদের হাসি–
মরণ নিয়ে তাই তো খেলি,
মরতে মোরা ভালোবাসি!’

বীরেনদা বললে, কিন্তু এ ভাবে মরা তো হবে না ভাই! পিপেগুলোকে ঢালের মতন রেখে পিপের আড়ালে আড়ালে চলো। পশুপক্ষীর মতন দূর থেকে শিকারির গুলিতে প্রাণ দিতে আমরা রাজি নই! ওরাও আমাদের কাছে আসুক–আমরা মানুষ, আমরা মরব বটে, কিন্তু মেরে মরব–চারিদিকে মরণকে দু-হাতে ছড়িয়ে দিয়ে মরব–ওদের জানিয়ে দিয়ে মরব যে, আমরা মানুষ!

সমুদ্রের মহা-গর্জনের সঙ্গে আবার অনেকগুলো বন্দুক গর্জন করে উঠল! অমিয় আবার গাইলে–

‘জীবন-মরণ একসাথে আজ
নতা-লীলায় মত্ত থাকে,
জীবন চাহে মরণকে ওই,
মরণ চাহে জীবনটাকে!
মরণ বলে– ‘জীবন রে ভাই,
বল তো আজ কোন সুরে গাই?

জীবন বলে–মরণ, এসো,
তোমার সুরেই বাজাই বাঁশি!
বুকের ভিতর জীবন নিয়ে
মরতে মোরা ভালোবাসি!

ফিরে দেখলুম, আমাদের জাহাজখানা একেবারে জলের তলায় ডুব মারলে–সমুদ্রের উপরে চক্রাকারে বিরাট একটা বুদ্বুদ তুলে। এবং ওদিক থেকে একখানা বোট তিরবেগে এগিয়ে আসছে, তার ভিতরে সব মানোয়ারি গোরা!

বীরেনদা বললে, "ওই ওরা আসছে! তোমরা প্রস্তুত হও–মারতে আর মরতে?

আমি বললুম, আমি প্রস্তুত! অমিয় কিছু বললে না, হাসতে হাসতে আবার গান ধরলে–

জীবন নিয়ে জীবন দেব,
অমনি মোরা দেব না গো!
জাগো মরণ জীবন-হরণ!
মরণ-হরণ জীবন জাগো!
আজকে দেহের রক্ত মাঝে
ভীষণ-মধুর ছন্দ বাজে,
ক্ষুদ্র মনে রুদ্র নাচে-
মৃত্যু নিল শঙ্কা গ্রাসি!

এই জীবনের বাসর-ঘরে
মরতে মোরা ভালোবাসি।”

আবার একঝাঁক গুলি এসে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। মরণ যেন আজ আমাদের জেগে-ওঠা জীবনকে দংশন করতে রাজি নয়,–যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে সত্যসত্যই মরণ আজ সন্ধি স্থাপন করেছে। তারপর আরও এক অভাবিত ব্যাপার! গোরার দল বোট নিয়ে আমাদের পেরিয়ে চলে গেল–বোম্বেটেদের নৌকো যেদিকে গিয়েছে সেই দিকে। মাত্র আমাদের এই তিনজনকে ধরতে এসে ওরা বোধ হয় নৌকা-বোঝাই বোম্বেটের দলকে পালাবার সুযোগ দিতে রাজি নয়।

বীরেনদা সহাস্যে বললে, যাক, এ যাত্রাও মারবার আর মরবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া গেল!’

আমি বললুম, সেজন্যে খুশি হবে কি না বুঝতে পারছি না। এই তো দ্বীপ আমাদের সামনে। এখন এর ভিতরে আবার যে কী নাটকের অভিনয় শুরু হবে, কোনখানে যে তার যবনিকা পড়বে, কিছুই তো আন্দাজ করতে পারছি না!

খানিক পরেই দ্বীপে এসে উঠলুম–আবার পৃথিবীর মাটির উপরে পা দিলুম–মনে হল, বিদেশ থেকে আবার যেন মায়ের কোলে এসে উঠলুম।

সমুদ্রতটের বালির বিছানার পরেই কী ভীষণ অরণ্য! লতায়-পাতায় জড়ানো বড়ো বড়ো নানাজাতির গাছ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে সাগর-গর্জনের সঙ্গে মর্মর-গর্জন মিশিয়ে দিচ্ছে! তাদের পায়ের তলাতেও এমন নিবিড় জঙ্গল যে, পথ খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা, দুই হাত পরে

কী আছে তাও দেখবার কি বোঝবার উপায় নেই। বনজঙ্গল যে এমন দুর্গম হতে পারে আগে তা জানতুম না! এ অরণ্য যেন নিষ্ঠুর প্রহরীর মতন পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরের জনপ্রাণীকেও ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না!

অমিয় হতাশভাবে বললে, এ যে আর এক বিপদ! এ জঙ্গলের ভিতরে ঢুকলে কি আর বেরুতে পারব?

বীরেনদা বললে, ঢুকতে পারলে বেরুতেও পারব। কিন্তু কথা হচ্ছে, ঢুকি কেমন করে? বোধ হয় আমাদের পথ কেটেই ঢুকতে হবে। সরল, পিপের মুখ খুলে তিনখানা কুড়ুল বার করো তো!'

কিন্তু বীরেনদার কথা আমি শুনেও শুনলুম না,—আমার চোখদুটাে তখন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আছে–আমার গায়ের রোমগুলো তখন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে! জঙ্গলের ঘন লতা-পাতার আড়ালে লুকিয়ে দু-দুটাে অদ্ভুত চক্ষু জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে। সে চক্ষু কোনও পশুর চক্ষু নয়, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিও তার মধ্যে নেই! একটা জ্বলন্ত হিংসার ভাব, একটা ভূতুড়ে ক্ষুধার আগ্রহ যেন তাদের ভিতর থেকে ফুটে-ফুটে উঠছে!

বীরেনদা বললে, সরল, ও সরল! শুনতে পাচ্ছ? অমন করে ওদিকে তাকিয়ে আছ কেন?

আমি কাঠের পুতুলের মতন আঙুল তুলে জঙ্গলের সেইখানটা দেখিয়ে দিলুম। বীরেনদাও সেইদিকে চোখ ফিরিয়ে চমকে উঠল!—অস্ফুট স্বরে বললে, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য।'

অমিয়ও দেখলে–সবিস্ময়ে বললে, কী ওটা। জন্তু না ভূত?

বীরেনদা তিরের মতো সেইদিক পানে ছুটে গেল–নিজের বিপদের কথা একবারও ভেবে দেখলে না।

মৃত্যু-গহ্বর ও অস্থিসার হাত

আমি পিছু ডাকলুম, বীরেনদা, বীরেনদা! যেয়ো না–ওদিকে যেয়ো না!

কিন্তু বীরেনদা থামলেও না–ফিরেও তাকালে না, অকুতোভয়ে সেই হিংস্র ও প্রদীপ্ত চক্ষু-দুটোর দিকে অগ্রসর হল।

চোখদুটো আরও-জ্বলন্ত আরও-বিস্ফারিত হয়ে উঠল–ক্ষণিকের জন্যে। তারপর বিদ্যুতের মতন সাঁৎ করে আড়ালে সরে গেল।

বীরেনদাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল...শুনতে পেলুম, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মড়মড় করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে কে চলে যাচ্ছে–দ্রুতপদে, দূর হতে আরও দূরে।

অমিয় আবার বললে, কী ওটা? জন্তু না ভূত, না মানুষ? যে-ঝোপে চোখদুটো আবির্ভূত হয়েছিল তার উপরে বার-কয়েক লাথি মেরে বীরেনদা বললে, কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু–আরে এ কী? অমিয়! সরল! পথ পাওয়া গেছে– পথ পাওয়া গেছে!'

এগিয়ে গিয়ে দেখলুম সেই ঝোপটার পাশ দিয়েই খুব সরু একটা পথ জঙ্গল ভেদ করে ভিতরদিকে চলে গিয়েছে।

বীরেনদা বললে, 'এতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে যে আমাদের দেখছিল, এই পথ দিয়েই সে এসেছে আর এই পথ দিয়েই সে পালিয়েছে।'

আমি বললুম, হয়তো সে পালায়নি। খানিক তফাতে গিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে আছে।'

বীরেনদা বললে, তার কথা পরে ভাবা যাবে অখন! আপাতত এই পথের মুখে দাঁড়িয়ে আমি পাহারা দিচ্ছি। ততক্ষণে তোমরা দুজনে মিলে এক কাজ করো। ওই পিপে তিনটের ভিতর থেকে কতকগুলো নেহাত দরকারি জিনিস বার করে নিয়ে, ওগুলোকে বালির ভিতরে পুঁতে রেখে এসো। শিগগির যাও—দেরি কোরো না।'

আমরা তাই করলুম। আগে পিপেগুলোর মুখ খুলে আমাদের দরকার হতে পারে এমন কতকগুলো জিনিস বার করে নিয়ে পোটলা বাঁধলুম। তারপর সমুদ্রতটের বালি সরিয়ে পিপে তিনটেকে একে একে পুঁতে ফেললুম। পাছে জায়গাটা আবার খুঁজে না পাই, সেই ভয়ে সেখানটায় নিশানা রাখতেও ভুললুম না।

বীরেনদা বললে, বোধ হয় তোমাদের কেউ দেখতে পায়নি। একটা বন্দুক আর একটা কুড়ুল আমাকে দাও। এখন এসো, আমরা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকি। কিন্তু খুব সাবধানে পথে চলতে হবে—এ অজানা জঙ্গল, বিপদের সম্ভাবনা চারিদিকেই।

আগে বীরেনদা, তারপর আমি, তারপর অমিয়—এই ভাবে আমরা অগ্রসর হলুম। ভারী সরু পথ—একসঙ্গে দুজনে পাশাপাশি এগুনো যায় না। বাঁ দিকে ঘন জঙ্গল, ডান দিকে ঘন জঙ্গল, মাথার উপরে অগুক্তি গাছের পাতা-ভরা ডালপালার চাদোয়া আকাশ ঢেকে আছে আর গাছের তলায় খালি শুকনো পাতার মড়মড়নি। চার হাত সামনেও নজর চলে না—চার হাত পিছনেও নজর চলে না।

বন ক্রমে আরও নিবিড় হয়ে উঠল—এত নিবিড় যে সেই দিন-দুপুরেই মনে হতে লাগল, আমরা যেন রাতের উথলে ওঠা আঁধার-সায়রের ভিতর দিয়ে কোন অপারে দিগ্বিদিক হারিয়ে সাঁতরে চলেছি।

বীরেনদা বললে, ইলেকট্রিক টর্চটা আমার হাতে দাও তো, আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

সেই অতি-নির্জন ও অতি-নিস্তব্ধ অরণ্য বীরেনদার গলার আওয়াজ শুনে যেন শিউরে শিউরে উঠল,—এ বন যেন মানুষের গলা কখনও শোনেনি, মানুষের ছায়া কোনওদিন গায়ে মাখেনি—নিজের নিঃসাড়তায় ও নিজের অন্ধকারে এ যেন নিজেই স্তম্ভিত হয়ে আছে। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, কিন্তু বীরেনদা, এমন গহন বনের ভিতরে এমন পথ বানালে কে? এ পথ তো আপনি তৈরি হয়নি!

বীরেনদা কেবল বললে, 'হ্যাঁ, এ পথ মানুষেরই হাতে তৈরি বটে। আবার সবাই চুপ। বীরেনদার হাতের বৈদ্যুতিক মশালের আলোটা থেকে থেকে পথহারা পাখির মতন সেই অরণ্য-কারাগারের চারিদিকে ছুটোছুটি করছে, তাই দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললুম।

মাঝে মাঝে বীরেনদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, আর কান পেতে কী শোনে, তারপর আবার চলতে থাকে। আমাদের সকলেরই মনে হতে লাগল, আমাদের আগে আগে পথের শুকনো পাতার উপরে আরও কারুর পায়ের শব্দ হচ্ছে। ও কে যাচ্ছে আমাদের আগে আগে?—সেই যার জ্বলন্ত চোখ?....নানা দিকে বার বার বিজলি-মশালের আলো ফেলেও কারুকে আবিষ্কার করা গেল না। কিন্তু সেই অজানা পায়ের শব্দ আমাদের আগে

আগে সমানেই এগিয়ে চলল—আমরা তাড়াতাড়ি এগুতে গেলেই সে-শব্দও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

বন যে অন্ধকার, এখন সেটা সৌভাগ্যের কথাই বলে মনে হতে লাগল। কারণ এর গর্ভের ভিতরে হয়তো এমন আরও অনেক বিভীষিকা লুকানো আছে, যা দেখলে আমাদের আবার মানে মানে সমুদ্রের ধারে ফিরে যেতে হবে। একবার এক জায়গায় বিজলি-মশালের আলো পড়তেই দেখতে পেলুম, প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ দুই চক্ষে অগ্নিবৃষ্টি করে আস্তে আস্তে গাছপালার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। আর এক জায়গায় বাঘের মতন বড়ো কী একটা জানোয়ার জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল! প্রতি পদেই মনে হতে লাগল, এই নিরেট অন্ধকারের রাজ্যে, চারিদিকে অদৃশ্য সব বিপদ লোলুপ চোখে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে, একবার কেউ একটু অন্যমনস্ক হলেই তারা সবাই মিলে হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়বে।

হঠাৎ আমাদের সামনে অন্ধকারের ভিতরে কীরকম একটা শব্দ হল—কার হাত থেকে কী যেন পড়ে গেল! দু-পা এগুতেই পায়ে কী ঠেকল। তুলে দেখি, বিজলি-মশাল—যা ছিল বীরেনদার হাতে।

কল টিপে আলো জ্বেলে যা দেখলুম, প্রাণ যেন উড়ে গেল। ঠিক দু-পা পরেই মাঠের মতন প্রকাণ্ড একটা গহ্বর হা করে আছে। আর আমার সামনে বীরেনদা নেই।

খুব নীচে থেকে—যেন পাতালের বুক ভেদ করে বীরেনদার গলার আওয়াজ পেলুম— সরল অমিয়! দড়ি ঝুলিয়ে দাও—দড়ি ঝুলিয়ে দাও—শিগগির।

সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা কান-ফাটানো প্রাণ-দমানো অট্টহাসি জেগে উঠল–হাহাঃ, হা হা হা হা–

সে হাসি মানুষের, না প্রেতের?

কিন্তু আমাদের তখন এমন অবসরও ছিল না যে, সে হাসি শুনে ভয় পাই! তাড়াতাড়ি আমি পথের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম, তারপর গহ্বরের ভিতরে মুখ বাড়িয়ে আলো ফেলে দেখলুম–প্রায় পনেরো-বিশ হাত নীচে কালো জল থই থই করছে। জলের চারিধারেই পাথুরে পাড় খাঁড়া ভাবে উপরে উঠেছে। কাজেই এর ভিতরে একবার পড়লে সাঁতার জানলেও বাঁচোয়া নেই। এই পনেরো-বিশ হাত দেওয়াল বেয়ে মানুষের পক্ষে উপরে ওঠা অসম্ভব।

এদিকে-ওদিকে বার-কয়েক বিজলি-মশালের আলো ফেলে বীরেনদাকে আবিষ্কার করলুম। পাড়ের ঠিক তলাতেই সাঁতার দিতে দিতে সে উপরে ওঠবার জন্যে নিস্ফল চেষ্টা করছিল।

বীরেনদা আবার চেঁচিয়ে বললে, শিগগির দড়ি ফেলে দাও–জলের ভেতরে কুমির আছে!’

কুমির! বিজলি-মশালটা তাড়াতাড়ি অমিয়ের হাতে দিয়ে, থলে থেকে দড়ি বার করে জলের ভিতরে ফেলে দিলুম। বীরেনদা সেই মুহূর্তেই হাত বাড়িয়ে দড়িটা ধরলে এবং পরমুহূর্তেই একটা প্রকাণ্ড কুৎসিত মাথা বীরেনদার ঠিক পিছনে জলের উপরে জেগে উঠল।

অমিয় চিৎকার করে বললে, বীরেনদা! তোমার পিছনে কুমির!

কিন্তু অমিয়ের কথা শেষ হবার আগেই জোরালো হাতের এক ঝাকানি দিয়ে বীরেনদা দড়ি ধরে জল ছেড়ে খানিকটা উপরে উঠে পড়ল।

কুমিরটা ফলার মুখছাড়া হয় দেখে তার লম্বা-চওড়া ল্যাজ দিয়ে বীরেনদাকে লক্ষ করে প্রচণ্ড এক ঝাপটা মারলে! সে ভীষণ ল্যাজ যদি বীরেনদার গায়ে লাগত, তাহলে তার হাড়গোড় নিশ্চয়ই গুড়ো হয়ে যেত–কিন্তু বীজেনদা আবার এমন এক ঝাঁকানি দিয়ে কুমিরের নাগালের বাইরে চলে এল যে, সেই বিষম টানের চোটে আমিও আর একটু হলেই জলের ভিতরে গুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলুম।

ওদিকে সেই ভয়ানক অট্টহাস্যের বিরাম নেই। সেই হাসির উচ্ছাসের পর উচ্ছাসে চারিদিককার রন্ধহীন অন্ধকার যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল!—অমিয় নানাদিকে বারবার আলো ফেলেও বার করতে পারলে না যে, কোথা থেকে কে অমন করে ওই ভূতুড়ে হাসি হাসছে.তারপর, বীরেনদা যখন নিরাপদে দড়ি বেয়ে আবার ডাঙার উপরে এসে উঠল, সেই হাসি তখন হঠাৎ থেমে গেল। চারিদিক আবার স্তব্ধ।

উপরে উঠেই বীরেনদার সর্বপ্রথম কথা হল–টর্চটা তো পেয়েছ দেখছি। কিন্তু পড়বার সময়ে আমি আমার বন্দুকটাও হারিয়েছি। দ্যাখো তো, বন্দুকটা ওপরেই আছে, না জলে পড়ে গেছে?'

সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকটাও উপরেই খুঁজে পাওয়া গেল! বীরেনদা খুশি হয়ে বললে, 'যে জায়গায় এসেছি, এখানে বন্দুকই হচ্ছে আমাদের প্রাণের মতো। বন্দুক হারালে প্রাণও হয়তো হারাতে হবে। ..অমিয়, মশালটা আমার হাতে দাও। এখন আবার পথ খুঁজে বার করতে হবে।'

পথ সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। গহ্বরের সামনে এসেই পথটা বাঁ দিকে বেঁকে পাড়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। অন্ধকারে তা দেখতে না পেয়েই বীরেনদা গহ্বরে পড়ে গিয়েছিল। আমরা আবার অগ্রসর হলুম–

এবারে আরও সাবধানে। কারণ, একে তো এই সরু পথ,—তার উপরে বাঁ দিকে ঘন জঙ্গল আর ডান দিকে সেই মৃত্যু-গহ্বর, একবার পা পিছলোলে কি হোঁচট খেলে আর রক্ষা নেই।

প্রায় মাইলখানেক হাঁটবার পর গহ্বর শেষ হল, কিন্তু তখনও সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার আর আঁকাবাঁকা পথের শেষ পেলুম না। দুইধারে ঘন-বিন্যস্ত অরণ্য নিয়ে পথ আবার কোনও অজানার দিকে চলে গেছে।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ সেই বিষম পথ শেষ হল–আমরা আবার খোলা আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালুম–উজ্জ্বল আলোকের আঘাতে আমাদের অন্ধকার-মাখানো চোখগুলো যেন কানা হয়ে গেল!

চোখ যখন পরিষ্কার হল, দেখলুম সে এক অপূর্ব দৃশ্য! মস্ত এক মাঠ–তার বুকে ছোটো ছোটো চারাগাছ আর ঘাসের মধুর শ্যামলিমা আর রকম-বেরকম বনফুলের রামধনু-রঙের লীলা! মাঠের পরেই প্রকাণ্ড এক পাহাড় আকাশকে ধরবার জন্যে যেন উপরে–আরও উপরে উঠে গেছে। তার কোলে লাখো লাখো গাছ সমুদ্র-স্নান থেকে ফিরে-আসা হাওয়ার ঠান্ডা ছোঁয়া পেয়ে পরমোল্লাসে দুলে দুলে নেচে উঠছে! পাহাড়ের মাঝখান থেকে একটি ঝরনা গলানো রুপোর ধারার মতন পাথরে পাথরে লাফাতে লাফাতে কৌতুক-হাসি হাসতে হাসতে নীচে নেমে এসে, মাঠের সবুজ বুক আদরে ভিজিয়ে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর সেই রূপের হাটে নানা-জাতের পাখিরা গানের আসর বসিয়ে প্রাণ মাত করে দিচ্ছে!

অমিয় আহ্লাদে মেতে গান শুরু করলে–

স্বরগের বুক থেকে আলো-মেয়ে দুলে দুলে–

নেমে আসে বনে বনে, নেমে আসে ফুলে ফুলে।
কাননের বুক থেকে,   আদরের ডাক ডেকে
নাচে পাখি, গানে তার মরমের দ্বার খুলে!
নীলিমার বুক থেকে,   সুষমার মুখ দেখে,
ছুটে চলে সমীরণ তটিনীর কূলে কূলে!
কুসুমের বুক থেকে,   লাল-নীল রং মেখে,
ওড়ে কত প্রজাপতি ছোটো পাখা খুলে খুলে!
ধরণীর বুক থেকে,   আয় তোরা যাবি কে কে,—
স্বপনের তপোবনে তপনের তাপ ভুলে!

বীরেনদা একদিকে আঙুল তুলে ধরে বলে উঠল, ‘থামো অমিয়, ওদিকে একবার চেয়ে দ্যাখো!”

ফিরে দেখি, সেই চোখদুটো! সেই ক্ষুধা-ভরা হিংসামাখা অগ্নিউজ্জ্বল চোখদুটাে আবার একটা জঙ্গলের ঝোপের ফাঁক দিয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে পলক-হারা হয়ে আছে! আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, কেবল সেই চোখদুটাে! তার চাউনি দেখলে খুব সাহসীরও বুকের কাছটা হিম হয়ে যায়!

অমিয় রবিবাবুর গান ধরলে–

ওই আঁখি রে
ফিরে ফিরে চেও না চেও না, ফিরে যাও,
কী আর রেখেচ বাকি রে!

বীরেনদা আর আমি দুজনেই একসঙ্গে বন্দুক তুললুম।

কিন্তু চোখ দুটো আবার সাঁৎ করে সরে গেল–জঙ্গলের পথে আবার শুকনো পাতার মড়মড়ানি উঠল, বুঝলুম যার চোখ সে দৌড়ে পালাচ্ছে!

বীরেনদা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'কার ওই চোখ? ও কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে? ও চোখে তো মানুষের চাউনি নেই! তবে কি সত্যি সত্যি ভূত-প্রেত বলে–

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ও-কথা যেতে দাও বীরেনদা! এখন আমরা কী করব বলো।'

বীরেনদা বললে, "আমরা? আমরা আপাতত ওই পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠব। ওইখানে ঝরনার ধারে বসে আজকের রাতটা তো কাটিয়ে দি, কালকের কথা কালকে ভাবা যাবে অখন।'

পাহাড়ের ওপরে এসে যে জায়গাটি আমাদের পছন্দ হল, তার একধারে ঝরনা, একধারে গভীর খাদ আর একধারে পাহাড়ের গা খাড়া ওপরে উঠে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়েই– গুহ নয়, অথচ গুহার মতনই একটা জায়গা ছিল, আমরা স্থির করলুম, তার ভিতরে বসেই আজকের রাতটা কাটিয়ে দেব।

সমুদ্রে বাপ দেবার আগে জাহাজের ভাড়ার ঘর থেকে আমরা অনেকগুলো বিস্কুট, জ্যাম-জেলি ও রক্ষিত মাছ-মাংসের টিন সংগ্রহ করে এনেছিলুম। ঝরনার ধারে বসে মুখহাত ধুয়ে সেই টিনের খাবারেই পেট ভরালুম–খাবারগুলো লাগল যেন অমৃতের মতো। আর ঝরনার জল? সে যে কী মিষ্টি, তা আর কী বলব!

তারপর সেই আধা-গুহার ভিতরে গিয়ে বসলুম। তখন বেলা যায় যায়। সন্ধ্যা তার ছায়া-আঁচল দুলিয়ে তখন ডুবে-যাওয়া সূর্যের শেষ আলোটুকু নিবিয়ে দিয়েছে। দু-একটা বাসা-ভোলা পাখি মাঝে মাঝে তখনও এদিকে-ওদিকে উড়ছে ও আসন্ন আঁধারকে দেখে ভীতচকিত স্বরে ডেকে ডেকে উঠছে।

স্থির হল, প্রথম রাতে বীরেনদাকে, মাঝ-রাতে আমাকে আর শেষরাতে অমিয়কে জেগে পাহারা দিতে হবে। কারণ তিনজনে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে এই বিপদ-ভরা বন-জঙ্গলে কাল সকালে হয়তো কারুকেই আর জেগে উঠতে হবে না।

আমি আর অমিয় শুয়ে পড়লুম! সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি আর দুশ্চিন্তায় দেহ আর মন যেন এলিয়ে পড়েছিল, শুতে না শুতেই ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেলুম। ...মাঝ-রাতে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বীরেনদা শুয়ে পড়ে চোখ মুদলে। এককোণ ঘেঁষে পাহাড়ের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসলুম। রাত তখন থমথম করছে—বাইরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় চকমকিয়ে উঠে ঝরনা তার অশ্রান্ত সংগীতকে যেন নিশীথিনীর নিসাড় বুকের ভিতরে দুলিয়ে দুলিয়ে দিচ্ছে!

রাতের একটি বাঁধা সুর আছে! সে সুর গাছের পাতার নয়, ঝিঁঝিপোকার নয়, বাতাসের নয়, বা আর কোনও জীবের নয়—সে হচ্ছে রাতের একেবারে নিজস্ব সুর! বিজন স্তব্ধতার ভিতরে তা শোনা যায়, বোবা আকাশকে স্তম্ভিত করে, সারা ধরণীকে আকুল করে সে বিচিত্র সুর ঝিমঝিম করে বাজতে থাকে আর বাজাতে থাকে, সে অদ্ভুত সুর শুনলে ভাবুকের মনের ভিতরটা যেন কেমন কেমন করে ওঠে—রাতের বীণায় সে যেন

ভগবানের নিজের হাতে গাথা রাগিণী, যার অস্ফুট ঝঙ্কারের ভিতরে পৃথিবীর জন্ম-মৃত্যুর রহস্য লুকানো আছে!

রাতের সেই একটানা সুর কান পেতে শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে হল বাইরের আবছায়ার ভিতর থেকে চমকে উঠল আবার দুটো জ্বলজ্বলে তীব্র চোখ। সেই দুটো চোখ–যা আজ সারা দিন আমাদের পিছু ছাড়েনি। ভালো করে চেয়ে কিন্তু আর কিছুই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম, আমারই মনের ভুল।

আচম্বিতে কী একটা জীবের কাতর আর্তনাদে ও বাঘের ভীষণ গর্জনে চারিদিক কাঁপতে লাগল–সঙ্গে সঙ্গে ঘুম-ভাঙা পাখিদের ব্যস্ত চিৎকার! খানিক পরেই সব আবার চুপচাপ! তারপরেই দেখি, একখানা কালো-কুৎসিত অস্থিসার হাত পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে, ধীরে ধীরে গুহার ভিতরে ঢুকছে। দেহ নয়, শুধু একখানা হাত! তার বাঁকা বাঁকা লম্বা আঙুলগুলো আকুল হয়ে খুঁজছে যেন কাকে!

ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলুম–একী, এ কী ব্যাপার? আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, হাতখানা বীরেনদার ঘুমন্ত দেহের উপরে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, তারপর হঠাৎ খপ করে তার গলা চেপে ধরলে।

অজানা দ্বীপের রানি

বীরেনদার বিপদ দেখে এক পলকেই আমার সমস্ত অসাড়তা ছুটে গেল–বিদ্যুতের মতন সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বন্দুকের নলটা সেই অস্থিসার হাতখানার উপরে রেখে ঘোড়া টিপলুম।

গুড়ুম করে বন্দুক গর্জন করে উঠল–সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ এক আর্তনাদ,—হাতখানাও সোঁ করে সরে গেল!

বীরেনদা ধড়মড় করে উঠে বসে গলায় হাত বুলোতে বুলোতে যাতনাভরে বললে, 'সরল, সরল!"

অমিয়ও উঠে বসে চোখ কচলাতে কচলাতে বললে, "হয়েছে কী বীরেনদা? হয়েছে কী সরলদা?

আমি ব্যাপারটা সব খুলে বললুম।

বীরেনদা তখনই বিজলি-মশাল আর বন্দুকটা তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু গুহার মুখে খানিকটা রক্ত ছাড়া বাইরে আর কারুকে দেখতে পাওয়া গেল না।

অমিয় আবার রবিবাবুর গান ধরলে ঃ–

'সে যে, পাশে এসে বসেছিল,
তবু জাগি-নি,
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল,
হতভাগিনী!'

আমি বললুম, কিন্তু এই ভূতুড়ে শত্রুটা তো ভারী ভাবিয়ে তুললে দেখছি! এ ধরাও পড়ে না, আমাদের ছেড়েও যায় না!

বীরেনদা বললে, কিন্তু বাছাধন আপাতত বোধ হয় আর শিগগির এমুখো হচ্ছেন না। সরলের গুলি খেয়ে এখন হাত নিয়ে কিছুদিন কাত হয়ে থাকুন তো?

এমনি সব কথা কইতে কইতে আকাশ ধীরে ধীরে ফরসা হয়ে এল।

বনের পাখিরা অগ্রদূত হয়ে খবর দিলে–আর ভয় নেই, এখনই আসবে আনন্দের সাথী প্রভাত ।

ভোর হল। বনের সবুজের ওপরে কচি রোদ এসে কাচা সোনার জলের ছবি একে দিলে! মৌমাছি আর প্রজাপতিদের ভিতরে আবার মৌ-চয়নের সাড়া পড়ে গেল।

বীরেনদা বললে, 'এসো, আমরা এখন পাহাড় থেকে নেমে পড়ি। পোটলাপুটলি বেঁধে নাও।'

অমিয় বললে, কিন্তু বীরেনদা, এখন যে আমাদের শালগ্রামের ওঠা-বসা। এখানে থাকাও যা, নীচে নামাও তা।'

বীরেনদা বললে, না না, তুমি বুঝছ না অমিয়! একবার চারিদিকটা ঘুরে দেখে আসা ভালো! নইলে কোনদিক দিয়ে কখন যে বিপদ ঘাড়ে এসে পড়বে, তা জানবার আগেই মারা পড়ব।".

ঝরনার জলে প্রাতঃস্নান সেরে, কিছু জলভাবার খেয়ে আবার আমরা পাহাড় ছেড়ে নীচে নেমে গেলুম।

মাঠ পেরিয়ে একটা বনে গিয়ে পড়লুম। এবারের বনেও জঙ্গল আর বড়ো বড়ো গাছের অভাব নেই বটে, কিন্তু আগেকার মতন এ বনটা তেমন অন্ধকার নয়।

আমি বললুম, তোমরা একটু সাবধান হয়ে চলো। কারণ কাল রাতে আমি বাঘের ডাক শুনেছি।'

অমিয় বললে, "বাঘ-টাঘের সঙ্গে এখন দেখা করতে চাই না বটে, কিন্তু একটা হরিণটরিণ পেলে আজকের দিনটা নেহাত মন্দ কাটে না–কী বলো বীরেনদা?

বীরেনদা বললে, 'পৃথিবীর চারিদিকেই হিংসার খেলা। বাঘ খুঁজছে আমাদের, আমরা খুঁজছি হরিণদের। আমরা ভাবি বাঘকে হিংসুক আর আমাদের হিংসুক ভাবে হরিণরা। অদ্ভুত এই দুনিয়া!

আমি কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই মাথার উপরকার মস্তবড়ো গাছ থেকে ঝুপ ঝুপ করে কারা লাফিয়ে পড়ল এবং কিছু দেখবার বা বোঝবার আগেই এমন অতর্কিতে তারা আমাদের আক্রমণ আর কাবু করে হাত-পা বেঁধে ফেললে যে, আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলুম!

তারা দেখতে খুব জোয়ান, যেন মিশমিশে কালো আবলুশ কাঠ থেকে কুঁদে তাদের দেহগুলো গড়া হয়েছে। কারুর হাতে ধনুক-বাণ, কারুর হাতে বর্শা। গলায়, কানে, বাহুতে হাড়ের গয়না আর পরনে এক এক টুকরো নেংটি ছাড়া আর কিছুই নেই। দলে তারা বেশ পুরু–অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ জন।

আমাদের হাত-পা আচ্ছা করে বেঁধে তিনজনকেই তারা মাটির ওপরে শুইয়ে রাখলে। তারপর আমাদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অজানা ভাষায় হাত-মুখ নেড়ে তারা কী বলাবলি করতে লাগল।

অমিয় বললে, ও বীরেনদা! এখন বোধ হয় আমাদের আর হরিণের মাংস খাবার কোনোই আশা নেই। এই কেলে স্যাঙাতরাই আমাদের হয়তো আগুনে পুড়িয়ে কাবাব বানিয়ে উদরসাৎ করবে।'

বীরেনদা বললে, 'চোখে বড়ো ধুলো দিয়েছে হে। বোম্বেটে, মানোয়ারি গোরা, হাঙর, কুমির আর সমুদ্রকে এড়িয়ে শেষটা যে এই বুনোদের পাল্লায় এমন বোকার মতো ধরা পড়ে যাব, আগে কে তা জানত?

আমি বললুম, ধরা-পড়া বলে ধরা-পড়া! একেবারে নট নড়ন-চড়ন, নট কিছু ছাড়ান পাবার কোনোই উপায় নেই, দয়াও পাব না বোধ হয়। ওদের গলায় কী ঝুলছে দেখছ তো? মড়ার মাথার খুলি।

আচম্বিতে কাছেই শিঙার মতন কী একটা বেজে উঠল–সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল কোথা থেকে অনেক ঢোলের আওয়াজ এবং অসভ্য মানুষগুলো সসম্ভ্রমে নুয়ে পড়ে আমাদের কাছ থেকে খানিকটা তফাতে সরে দাঁড়াল।

দেখলুম, বনের চারিদিক থেকে পিলপিল করে অসভ্যের পর অসভ্য যোদ্ধা বেরিয়ে আসছে নাচতে নাচতে, বর্শা নাচাতে নাচাতে বা ঢোল বাজাতে বাজাতে।

অমিয় বললে, 'ও বীরেনদা–আরও আসে যে! কী করা যায় বলো দেখি? কেলে ভুতগুলো দূরে সরে গেছে, বন্দুকগুলোও হাতের কাছে পড়ে রয়েছে, আর আমার মনও বলছে, এই বাঁধন-দড়িগুলো অল্প চেষ্টা করলেই আমরা ছিড়ে ফেলতে পারি।'

বীরেনদা বললে, দড়ি ছেঁড়বার সময় এখনও আসেনি। ওদের হাতেও তির-ধনুক রয়েছে, বলা তো যায় না–যদি ওদের তিরে বিষ মাখানো থাকে? তার চেয়ে এখন চুপ করে থাকাই ভালো, দ্যাখো না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

দেখতে দেখতে বনের আশপাশ লোকে লোকে ভরে গেল–সকলেরই কৌতুহলী চোখ আমাদের দিকে আকৃষ্ট।

হঠাৎ আবার শিঙা বাজল–সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নাচ-বাজনা থেমে গেল। সকলে একেবারে পাথরের মূর্তির মতন স্থির ও স্তব্ধ।

একদিককার ভিড় সরে গেল। সেইদিকে তাকিয়ে যা দেখলুম সে এক অকল্পিত দৃশ্য! অপূর্ব এক তরুণীর মূর্তি–রং তার ফুটন্ত শ্বেতপদ্মের মতো! তরুণীর মেঘের মতন কালো চুল পিছনে, কাঁধে, বুকে গোছায় গোছায় এলিয়ে পড়েছে এবং তার বুক থেকে উরু পর্যন্ত বাঘের ছালে ঢাকা!

সমস্ত মন বিস্ময়ে ভরে উঠল–কে এই নবযৌবনা, মানবী না বনদেবী? মূর্তিময়ী স্বপ্ন-সুষমার মতন আমাদের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তরুণী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দয়াভরা দুটি সুন্দর ডাগর চোখে আমাদের মুখের পানে চেয়ে রইল নীরবে।

বীরেনদা মোহিত স্বরে বললে, সরল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, এ মূর্তি এখানে কী করে এল?'

আমাদের সকলকে অধিকতর বিস্মিত করে তরুণী খুব নরম গলায় পরিষ্কার বাংলায় বললে, "আপনারা কি বাঙালি ?

প্রথমটা নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে আমরা অবাক হয়ে রইলুম। তারপর আবার সেই জিজ্ঞাসা শুনে আমি বললুম, হ্যাঁ।

তরুণী অভিভূত কণ্ঠে বললে, কত দিন পরে দেশের কথা শুনলুম, কত দিন পরে বাঙালিকে দেখলুম!'

বীরেনদা বললে, “আপনার কথা শুনে আপনাকেও তো বাঙালি বলেই মনে হচ্ছে।’

—‘হ্যাঁ, আমি বাঙালির মেয়ে।’

—‘বাঙালির মেয়ে! এইখানে–এই অজানা দ্বীপে–এই অসভ্যদের মাঝখানে!”

তরুণী করুণ স্বরে বললে, ‘সে অনেক কথা, পরে বলব! ...আপাতত শুনে রাখুন, আমি এই দ্বীপের রানি, আর আপনারা আমার বন্দি। আপনাদের সঙ্গে এখন আমি আর কথা কইতে পারব না, তাতে আপনাদেরই অমঙ্গল হবে। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমি থাকতে আপনাদের কোনও ভয় নেই।’

—এই বলেই তরুণী ফিরে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে আমাদের অবোধ্য ভাষায় সঙ্গের লোকদের ডেকে কী বললে।

অমনি আবার শিঙা বেজে উঠল–সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢোল বাজানো, নাচ ও হইচই শুরু হল। তারপর কয়েকজন লোক এসে আমাদের পায়ের বাঁধন খুলে দিলে এবং উঠে তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

তরুণী রানিকে নিয়ে অসভ্য লোকগুলো নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল–চারিদিকে কড়া পাহারা নিয়ে আমরাও অগ্রসর হলুম।

অমিয় বললে, সরলদা, হাত বাঁধা, কাজেই হাততালি দিতে পারব না, কিন্তু গলা যখন খোলা আছে তখন গান গাইব না কেন? বলেই শুরু করলে –

ওগো অজানা দেশের রানি!
তোমার মুখেতে শুনি আমাদের
আপন প্রাণের বাণী।

কোন অমরার তুমি সে জোছনা,
বলো বীণা-স্বরে কমললোচনা!
পূজিব তোমাকে মধুরবচনা,
জীবন ভরিয়া জানি–
শোনো, অজানা, অচেনা রানি।

ফোটে রাঙা ফুল চুমিয়া চরণে,
দেখে গায় মন নতুন ধরনে,
হব তব দাস জীবনে-মরণে,
রহিব অবাক মানি–
তুমি তরুণী অরুণী রানি!

বীরেনদার দার্শনিকতা

কখনও ছায়া-দোলানো বনপথ দিয়ে, কখনও রোদ-মাখানো সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, এবং কখনও বা চোখ-ভোলানো ছোটো ছোটো পাহাড়ের কোল দিয়ে প্রায় মাইল-চারেক পার হয়ে আমরা একটি বড়ো গ্রামে এসে হাজির হলুম।

গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি, এ গ্রাম যেন তার মূর্তিমান প্রতিবাদ! কতকগুলো পাতাছাওয়া হেলে-পড়া ভাঙা-চোরা কুঁড়েঘর—এক-একটা গর্তের মতো ঢোকবার পথ ছাড়া সে ঘরগুলোতে আলো-হাওয়া আসবার কোনও উপায়ই নেই। পথঘাটকে আঁস্তাকুড় বললেও বেশি বলা হয় না।

এক-একটা ঘরের সামনে আবার অনেকগুলো করে রোদে-শুকনো মানুষের মুণ্ড ঝুলছে! পরে শুনেছিলুম, এগুলো নাকি বড়ো বড়ো সর্দারের বাড়ি। ছলে-বলে-কৌশলে যে যত বেশি শত্রুকে স্বহস্তে বধ করে তাদের মুণ্ড সংগ্রহ করতে পারে, এ দেশে নাকি সেইই তত বড়ো সর্দার বলে সম্মান পায় এবং আপনার বড়োত্বের প্রমাণস্বরূপ মুণ্ডগুলোকে রোদে শুকিয়ে বাড়ির সামনে এই ভাবে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখে। এই কথা শোনবার পর যতদিন এ দেশে ছিলুম, কাঁধের উপরে নিজেদের মুণ্ডগুলোকে ঠিকঠাক বজায় রাখবার জন্যে সর্বদাই অত্যন্ত সাবধানে থাকতুম।

এরই মধ্যে একখানা বাড়ি দেখলুম—যার দিকে সহজেই সকলের নজর পড়ে। এ বাড়িখানাও পাতা দিয়ে ছাওয়া হলেও আর সব ঘর বা বাড়ির চেয়ে বড়ো তো বটেই, তার উপরে ঝকঝকে-তকতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়ির সুমুখে দুজন লম্বাচওড়া লোক বর্শা হাতে করে পাহারা

দিচ্ছে। এইখানা রানির বাড়ি বলে আন্দাজ করলুম এবং একটু পরেই দেখলুম আমাদের আন্দাজ ভুল নয়।

আমাদের দেখবার জন্যে গাঁয়ের মেয়েরা পর্যন্ত আজ রাস্তায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে! পুরুষদের মতন এখানকার স্ত্রীলোকদেরও লজ্জা রক্ষা পেয়েছে কেবলমাত্র এক এক খণ্ড সরু লেংটির দ্বারা। তবে মানুষের হাড়ের বদলে তারা পাথরের বা প্রবালের গয়না ব্যবহার করে নিজেদের জাতিসুলভ কোমলতার মর্যাদা রেখেছে দেখে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলুম।

রানি আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না, কেবল প্রভুত্বের স্বরে কী একটা হুকুম দিয়েই বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

তারপর আমাদের হাতেরও বাঁধন খুলে দিয়ে ইঙ্গিতে জানালে, আমরা যেন ওই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করি। আমরাও আর কালবিলম্ব না করেই ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। একটা লোক এসে আমাদের পোটলাপুটলি আর বন্দুক-তিনটে ঘরের মেঝের উপরে রেখে দিয়ে চলে গেল। উকি মেরে দেখলুম, দরজা বা গর্তের বাইরেই প্রায় বিশ-বাইশ জন লোক পাহারা দিচ্ছে।

আমি বললুম, বীরেনদা, এরা বোধ হয় জানে না যে বন্দুক কী চিজ। তা জানলে কি আর এগুলো আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে যেত?

বীরেনদা অন্যমনস্কের মতো শুধু বললে, 'হুঁ।'

অমিয় বললে, আচ্ছা বীরেনদা, আজ হঠাৎ তুমি এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন বলো দেখি? এমন অ্যাডভেঞ্চারে কোথায় তুমি খুশি হয়ে নাচবে, না, কেবল হুঁ, হা' দিয়েই কথা সারছ। তোমার হল কী বীরেনদা? কী ভাবছ তুমি?

বীরেনদা একটু কেঠো হাসি হেসে বললে, আকাশ আর পাতালের কথা ভাবছি ভাই। —‘আকাশ আর পাতাল চিরদিনই আছে আর চিরদিন থাকবেও। তা নিয়ে আবার চিন্তা-জুড়ে আক্রান্ত হওয়া কেন?

—‘ঈশ্বরও চিরদিন আছেন আর চিরদিন থাকেন। তবু কি মানুষ দিন-রাত তাঁরই কথা ভাবতে চেষ্টা করে না?

আমি বললুম, বীরেনদী, তুমি যে আবার হঠাৎ দার্শনিক হয়ে পড়লে দেখছি। ব্যাপার কী?

—দার্শনিক হওয়াটা কি নিন্দের কথা?

—উহু, মোটেই না। কিন্তু আমরা জানতে চাই বীরেনদা, তুমি কি আজ রূপসী রানিকে দর্শন করেই দার্শনিক হয়ে উঠেছ?

বীরেনদা রেগে কটমট করে আমার দিকে চাইলে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। অমিয় ফিক করে হেসে ফেলে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গাইলে–

‘কে জানে কী চোখে দেখেছি তোমায়,
প্রাণ আজ খালি ওই নাম গায়,
সুষমা-কুসুম দেখে শুধু চায়
হতে তার ফুলদানি-
ওগো না-জানা দ্বীপের রানি!’

বীরেনদা খপ করে অমিয়ের চুল ধরে এক টান মেরে বললে, তোমার ওই রাবিশ গান থামাও অমিয়! তোমার গান শোনবার জন্যে আমার কোনোই আগ্রহ নেই!'

বাংলা দেশের ছেলে

আজ দু-দিন এই ঘরে বন্দি হয়ে আছি। বাইরে দিন-রাত পাহারা, আমরা বেরুবার চেষ্টা করলেই জানোয়ারের শামিল এই বুনো মানুষগুলো বর্শা উচিয়ে তেড়ে আসে।

এরা এর মধ্যে যে-সব খাবার পাঠিয়েছে তা স্পর্শ করবার ভরসা আমাদের হয়নি– কে জানে বাবা তার ভিতরে সাপ-ব্যাং কী আছে। আমাদের মতন সভ্য মানুষের পেটে ঢুকে তারা যদি উলটা েরকম উৎপাত শুরু করে তাহলে এই অমানুষের দেশে তার ঠালা সামলাবে কে?..কাজেই পোটলার ভিতরে যে সব চেনা খাবার ছিল তাই খেয়েই উদরস্থ অগ্নিদেবকে ঠান্ডা রাখবার চেষ্টা করলুম।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ রাজবাড়ি থেকে আমাদের ডাক পড়ল। রাজবাড়ির গায়ে লাগানো খানিকটা জমির উপরে অনেক ফুলগাছ বসানো হয়েছে। এই অসভ্যের মুল্লুকে বাগান রচনার চেষ্টা দেখে প্রথমটা আশ্চর্য হয়েছিলুম! কিন্তু তার পরেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই রানির ইচ্ছাতেই এই বাগানের উৎপত্তি হয়েছে।

বাগানের মাঝখানে একখানা বেদির উপরে রানি বসেছিলেন–তার পরনে ঠিক বাঙালির মেয়েরই মতন কাপড়, কেবল গায়ে কোনও জামা ছিল না। পরে শুনেছিলুম, জামা আর কাপড় পরা নাকি এদেশে সমাজবিরোধী কাজ, তাই অনেক চেষ্টার পর রানি শুধু কাপড় পরবার অধিকার পেয়েছিলেন।

রানিকে দেখে আমরা নমস্কার করলুম। তিনিও প্রতি-নমস্কার করে বললেন, ‘বসুন। কিন্তু আপনাদের ওই ঘাসের ওপরেই বসতে হবে। এ দেশে রাজা কি রানির সামনে কেউ আসনে বসতে পায় না!’

বীরেনদা ব্যস্ত কণ্ঠে শুধোলে, এদেশের রাজা কে?

রানি বললেন, রাজা কেউ নেই। আমি যে কুমারী।

বীরেনদা যেন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে মাটির উপরে বসে পড়ল।

আমি বললুম, কিন্তু রানিজি, আপনি কী করে এখানে এলেন?

—অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়। কতদিন আগে জানি না–বোধ হয় দশ-বারো বছর হল, আমি প্রথম এখানে এসেছি। আমার বাবা সায়েবদের ফৌজে কী কাজ করতেন। বাবা আর মায়ের সঙ্গে বাংলা দেশ থেকে জাহাজে চড়ে আমি চিনদেশে যাচ্ছিলুম। আমার বয়স তখন নয় বছর। সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠে আমাদের জাহাজকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেয়। বাবা আর মা কোথায় ভেসে গেলেন জানি না, কিন্তু আমি আর চ্যাং বলে এক চিনেম্যান ভাসতে ভাসতে এই দ্বীপে এসে পড়ি।

—আপনার সঙ্গে চ্যাং বলে এক চিনেম্যান ছিল?’

—‘হ্যাঁ!’

—সে কি এখনও এখানেই আছে?

—না, শুনুন সব বলছি। দ্বীপের এই অসভ্যরা আমাদের দেখতে পেয়ে নিয়ে আসে। ঠিক সেই দিনই এদের রাজা কোনও ছেলে-মেয়ে না রেখেই মারা যান। আমাকে পেয়ে তারা ভাবলে যে, সাগরদেবতা আমাকে তাদের কাছে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই পুরুতরা খুব খুশি হয়ে ঘটা করে আমাকে তাদের সিংহাসনে বসালে।’

—আর সেই চ্যাং?

—চ্যাংকে তারা প্রথমে জুজু-ঠাকুরের সামনে বলি দিতে চেয়েছিল।

—জুজু-ঠাকুর?

—হ্যাঁ, জুজু হচ্ছে এদের প্রধান দেবতা। জুজুর পুরুতরাই এখানকার সর্বেসর্বা– আমাকেও তাদের হুকুম মেনে চলতে হয়।.তারপর, যে কথা হচ্ছিল। চ্যাংকে তারা বলি দিতে চাইলে। কিন্তু আমি অনেক কষ্টে চ্যাংকে বাঁচাই। চ্যাং কিছুদিন আমার সঙ্গে-সঙ্গেই রইল। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন জুজুর মন্দির থেকে একখানা হিরে চুরি করে কোথায় যে পালাল, আর তার কোনোই খোঁজ পাওয়া গেল না।'

অমিয় বললে, বোধ হয় সেই চ্যাঙের সঙ্গে আমাদেরও দেখা হয়েছে!'

আমরা সব কথা খুলে বললুম। রানি চিন্তিত ভাবে বললেন, 'চ্যাং তাহলে নিশ্চয়ই জুজুর মন্দির লুঠতে চায়! এই জুজুর মন্দিরে যত হিরে-মানিক আছে পৃথিবীর কোনও রাজার ঘরেও তা নেই!

বীরেনদা বললে, 'ভয় নেই, আমরা আপনাদের রক্ষা করব!'

রানি মাথা নেড়ে বিষণ্ন স্বরে বললেন, 'চ্যাঙের হাত থেকে তো আপনারা আমাদের রক্ষা করবেন, কিন্তু তার আগে পুরুতদের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করবে কে?

—সে আবার কী?

—পুরুতরা যে জুজুর সামনে আপনাদেরও বলি দিতে চায়!

আমরা সবাই চমকে উঠলুম। রানি বললেন, 'অবশ্য আপনাদের হয়ে আমি পুরুতদের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছি! আর আমার

কথা শুনে তাদের মনও অনেকটা নরম হয়ে এসেছিল। কিন্তু কেবল একজন পুরুতের শত্রুতায় আমার চেষ্টা সফল হয়নি। আপনাদের ওপরে তার বিষম রাগ!

—কেন?

—আপনারা যে এই দ্বীপে এসেছেন, তার কাছ থেকেই সে-খবর আমরা প্রথমে পাই। তার একখানা হাত ভয়ানক জখম হয়েছে, আপনারাই নাকি তার সেই দুর্দশা করেছেন!

অন্ধকার বনে সেই জুলন্ত চোখ আর পাহাড়ের গুহায় সেই সাংঘাতিক হাতের আবির্ভাবের সকল রহস্য এতক্ষণে বুঝতে পারলুম!

আমি বললুম, কিন্তু রানিজি, সে যে গায়ে পড়ে আমাদের আক্রমণ করেছিল! আর একটু হলেই সে যে আমাদের একজনকে খুন করত! '

রানি বললেন, ‘বুঝেছি, ওই পুরুতগুলো যে কী-রকম নিষ্ঠুর আর শয়তান আমি তা জানি,—তাদের প্রধান আনন্দ হচ্ছে নরহত্যা করা, বলি দিয়ে তারা মানুষের মাংস খায়। পুরুতরা এখন বলছে, একবার আমার কথায় চ্যাংকে ছেড়ে দিয়ে তারা ঠকেছে, এবারে আর তারা ঠকতে রাজি নয়। এ রাজ্যে তারা কোনও বিদেশিকে থাকতে দেবে না, তারা আপনাদের ধরে বলি দেবেই দেবে!’

বীরেনদা বললে, ‘বেশ, তারা চেষ্টা করে দেখুক না! আজ থেকেই তাহলে আমরা নিজমূর্তি ধরব–বাহুবলেই আমরা আত্মরক্ষা করব!’

রানি ম্লান হাসি হেসে বললেন, ‘হাজার হাজার লোকের ভিতরে আপনাদের তিনজনের বাহুবলের দাম কতটুকু?

—আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের বাহুবল আছে, আমাদের বন্দুক আছে–বন্দুকের শক্তি ওরা না জানুক, আপনি জানেন তো?

—জানি। কিন্তু অকারণে বিপদকে ডেকে এনে রক্তপাত করে লাভ কী? তার চেয়ে কৌশলে কার্যোদ্ধার করবার চেষ্টা করুন।

—কী কৌশল, আপনি বলুন।

—এই অসভ্যরা যেমন হিংসুক, তেমনি আবার ছেলেমানুষের মতন সরল আর ভিতু। যা অসম্ভব–অর্থাৎ এদের কাছে যা অসম্ভব, তা যদি কেউ সম্ভবপর করে তুলতে পারে, তার কাছে এরা কুকুরের মতন পোষ মানে।

—কিন্তু আমাদের কী করতে হবে?

—এখানে সবচেয়ে আদর পায় যাদুকররা। যাদুকরদের এরা ভয়ও করে, পূজাও করে। আপনারা কেউ কি কোনওরকম ছোটোখাটো ম্যাজিক-ট্যাজিক জানেন না?

বীরেনদা বললে, দাঁড়ান, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এখানে কি বাইরের সভ্যদেশ থেকে মাঝে মাঝে লোকজন আসে?'

—'কই, আমি তো দেখিনি। এই দ্বীপের বাইরে যে দেশ আছে, তাও এরা জানে না। তবে আমি এখানে থাকতে থাকতেই অনেক বছর আগে বোধ হয় একখানা জাহাজ এখানে এসে এক দিনের জন্যে নোঙর করেছিল। অসভ্যরা তাকে দেখে ভারী ভয় পেয়েছিল, আমার কাছে এসে সেই জাহাজকে সাগরদানব বলে বর্ণনা করেছিল। আমার বিশ্বাস, চ্যাং পালিয়েছিল সেই জাহাজে চড়েই।'

বীরেনদা বললে, "বেশ, তাহলে আমি এদের গোটাকয়েক ম্যাজিক দেখাতে রাজি আছি।'

রানী বললেন, তাহলে আর কিছু ভাবতে হবে না। আপনাকে এরা ঠিক জ্যান্ত জুজুঠাকুরেরই মতন পূজা করবে। তাহলে আজকেই আমি ঘোষণা করে দেব যে, যে-স্বর্গে জুজুঠাকুর থাকেন, আপনারা সেই স্বর্গ থেকেই জুজুর ভক্তদের সঙ্গে দেখাশুনো করতে এসেছেন। কাল সকালে রাজবাড়ির সামনের মাঠে আপনারা সকলকে আশীর্বাদ করবেন, আর নিজেদের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাবেন। কেমন, আপনার মান রাখতে পারবেন তো? কারণ এর ওপরেই আপনাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।'

বীরেনদা বললে, 'এরা যখন বাইরের জগতের কিছুই জানে না, তখন আমি নিশ্চয়ই এদের ভড়কে দিতে পারব।'

রানি আর কিছু না বলে হাততালি দিলেন, তখনই একজন লোক এসে হাজির হল। রানি খানিকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। কথা কইতে কইতে লোকটা সভয়ে ও বিস্ময়ে বার বার আমাদের পানে তাকিয়ে দেখতে লাগল–আমরা বুঝলুম, এর মধ্যেই তার চোখে আমরা অনেকটা উঁচু হয়ে উঠেছি!

কথাবার্তা শেষ হলে পর লোকটা রানিকে আর আমাদের মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে চলে গেল।

রানি আমাদের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললেন, 'এতক্ষণে, আমি হাপ ছেড়ে বাঁচলুম। তাহলে কাল সকালেই সময় ঠিক রইল। ...আসুন, এইবারে আমরা গল্প করি!'

অমিয় বললে, "রানিজি, আপনার নামটি তো এখনও আমাদের বলেননি?'

—আমার নাম? বিজয়া। আমি বিজয়ার দিনে জন্মেছিলুম বলে বাবা আমার ওই নাম রেখেছিলেন।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, আপনাদের পেয়ে যে আমার কী আহ্লাদ হয়েছে, মুখ ফুটে আমি তা বলতে পারব না! দেশের কথা আজ আমার কাছে স্বপ্নের মতন হয়ে গেছে, এ জীবনে হয়তো আর দেশে ফিরতেও পারব না। আর ফিরবই বা কার কাছে, আমার মাও নেই–বাবাও নেই।'

বীরেনদা বললে, "আমাদের দশা আরও খারাপ। দেশে আমাদের সব আছে, আমরা কিন্তু কোনওদিন আর সেখানে ফিরতে পারব না?

আমি মুখে আর কিছু বললুম না, কিন্তু আমার বুক ঠেলে কান্না জেগে উঠল। অমিয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আজ এই দূর বিদেশে বনের মাথায় যে চাঁদ উঠেছে, তার আলো আজ আমাদের বাংলা দেশেরও বুককে ভরিয়ে তুলছে। চাঁদের চোখে আজ বাংলা দেশের ছবি লেখা, কিন্তু আমাদের চোখে আঁকা শুধু অন্ধকার।'

রানি মমতা-মাখানো গলায় বললেন, মিছে ভেবে মন খারাপ করবেন না। তার চেয়ে আপনাদের কারুর গান জানা থাকলে আমাকে বাংলা দেশের একটি গান শোনান।'

বীরেনদা বললে, 'অমিয় হচ্ছে আমাদের ছোট্ট দলের বাঁধা গাইয়ে। গাও অমিয়!

অমিয় গাইলে–

আমরা সবাই বাংলা দেশের ছেলে রে ভাই,
বাংলা দেশের ছেলে!

চন্দ্র-তপন খেলে।
মা-বোন-বধূ আদর বিলায় ঘরে,
ফুল-রাগিনী শোনায় চাপা, অশোক, বকুল
গহন-বনেও গেলে।
চাঁদনি-মাখা নদীর ধারে ধারে,
তেপান্তরেও মাঠ-ভরা ঘাস দ্যায় যে বুকে
শ্যামলা হাসি ঢেলে।
কোকিল, শ্যামা আর পাপিয়ার সুরে
গানের স্বপন জাগে মানসপুরে,
নামলে আঁধার পল্লিবালা তুলসি-তলায়,
দেয় গো পিদিম জ্বেলে
গাঙের জলে ভাটিয়ালির স্বরে
মাঝিরা সব দেবতাদের নাম করে,
অনন্তেরি নিত্যপূজা মন্দিরে হয়–
সন্ধেবেলা এলে।
গঙ্গাতীরের মিষ্টি নরম মাটি,
তার ওপরেই আমরা সবাই হাঁটি,
সেই মাটিতেই মানুষ মোরা, চাই না স্বরগ
মাটির বাংলা ফেলে।

সামনেই খানিক স্পষ্ট, খানিক অস্পষ্ট পাহাড়ের পর পাহাড়ের শিখর ক্রমাতিউচ্চ নীলাকাশের সোপানশ্রেণির মতন উপর-পানে উঠে গিয়েছে

এবং তারই সবচেয়ে উঁচু শিখরের উপরে মুকুটের মতন জেগে রয়েছে, জ্বলন্ত চাঁদ। এই সুদূর বিদেশের বাগান থেকে অজানা সব ফুলের গন্ধ জেগে উঠে মনের ভিতরের মাদকতার আবেশ এনে দিচ্ছিল এবং রানি বিজয়াকে দেখাচ্ছিল, যেন এক জ্যোৎস্না-গড়া দেবী প্রতিমার মতো।

এরই ভিতরে অমিয়র গান আজ বাংলার কোকিল-পাপিয়ার অভাব পূরণ করলে– আমাদের মনে হতে লাগল, আমরা যেন আবার সেই বাংলা দেশের সবুজ কোলের ভিতরেই আপনজনের কাছে বসে আছি।

বীরেনদার স্তব্ধতা ক্রমেই বিস্ময়কর ও সন্দেহজনক হয়ে উঠছে। সে নির্বিকারে ঘাসের উপরে গা বিছিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল, নিস্পলক নেত্রে।

অমিয়র গান থেমে গেল। রানি কিছুক্ষণ মৌন থাকবার পর ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বললেন, ‘অমিয়বাবু, আজ আপনার গান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমি বিদেশে আছি। অনেক–অনেক বছর পরে আমার মনের ভিতর থেকে আজ এই প্রবাসের দুঃখ মুছে গেল। এই আনন্দের জন্যে আমি আপনাদের সকলকেই প্রণাম করি।

‘ভানুমতীর খেল’

পরের দিন খুব সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের ঘরখানা জনতা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে!

ঘরের ভিতরে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন। সকলেরই মুখ অত্যন্ত গম্ভীর এবং সকলেরই দেহ কাঠের পুতুলের মতন অত্যন্ত আড়ষ্ট।

প্রথমটা আমার বুক যেন ছাৎ করে উঠল! কে এরা? সেই হতভাগা জুজুর কাছে এরা কি আমাদের মুণ্ডগুলোকে ধড় থেকে আলাদা করবার জন্যে নিয়ে যেতে এসেছে? ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিলুম। কিন্তু তার পরেই দেখলুম, বিছানার উপরে বীরেনদা আর অমিয় অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে গদিয়ানি চালে বসে রয়েছে।

বীরেনদা শান্তভাবে হেসে বললে, ভয় নেই সরলভায়া! তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এদের দেখে তুমিও কি বুঝতে পারছ না যে, এরা হচ্ছে সেই জুজুর ত্যাদড় পুরুতের দল? এরা বোধ হয় ভানুমতীর খেল দেখবার জন্যে আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে।’

ঘরের লোকগুলোর দিকে ফিরে দেখলুম, তাদের সাজগোজ এখানকার সাধারণ লোকগুলোর মতন নয়। তাদের মাথায় রয়েছে পাখির পালকের মুকুট, সর্বাঙ্গে আঁকা নানান-রকম অদ্ভুত উলকি, হাতে বর্শা বা ধনুকের বদলে এক-একটা কালো রঙের লাঠি এবং কোমরে লেংটির বদলে বাঘের ছাল ।

লোকগুলোর চোখে কোনওরকম বন্ধুত্বের ভাব না মাখানো থাকলেও ভয়, সম্ভ্রম অথচ অবিশ্বাসের আভাস যেন রীতিমতোই পাওয়া গেল।

আমাদের সকলকে জেগে উঠতে দেখে তারা হাত তুলে দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

বীরেনদা বললে, সরল! অমিয়! তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ো। মুখ-হাত পা ধুয়ে নাও। তারপর আমাদের কার্দানি দেখিয়ে এই ব্যাটাদের চক্ষু স্থির করে দেব!'

রাজবাড়ির সামনের মাঠে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য! মস্ত মাঠ, প্রায় মাইল-খানেক লম্বা। চওড়াতেও সেইরকম। কিন্তু অতবড়ো মাঠেও আজ তিলধারণের ঠাঁই নেই। এ রাজ্যের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে যেখানে যে ছিল, সবাই আজ এইখানে এসে জুটেছে। মাঠ ভরে কিলবিল করছে কালো কালো সব ভূত-পেতনির মতন অগুনতি চেহারা! নজরে যতখানি পড়ল– প্রত্যেকেরই মুখ ভয়, সন্ত্রম আর কৌতুহলে ভরা!

মাঠের মাঝখানে একটা উঁচু মাচার মতন করা হয়েছে, সেইখানেই আমাদের নির্দিষ্ট স্থান। রানি বিজয়াও সেই মাচার উপরে বসে আছেন, তিনি আজ আমাদের মধ্যস্থ হবেন,— অর্থাৎ সকলকে বুঝিয়ে দেবেন আমাদের কথা।

ঘরে আজ সকালে যাদের দেখেছি, তাদেরই মতন। বুঝলুম, এরা হচ্ছে এই রাজ্যের পুরোহিতের দল। ভালো করে চেয়ে দেখলুম, প্রত্যেক মুখেই ঘৃণা ও অবিশ্বাসের আভাস! ভেলকিবাজি যদি তাদের মনের মতন না হয়, তাহলে আমাদের অবস্থাও যে আরামদায়ক হবে না তাও বেশ বোঝা গেল।

আচম্বিতে শিঙা ও দামামা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রানি বিজয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বীরেনবাবু, এইবার আপনার ম্যাজিক শুরু করুন– যদিও সে ম্যাজিক দেখে আমি ভুলব না!'

বীরেনদা উঠে দাঁড়াল। একবার লোক ভুলোবার জন্যে আকাশ-পানে মুখ ও হাত তুলে চোখ মুদে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মুখে গাম্ভীর্যের বোঝা নামিয়ে প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত করে চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুড়ে বললে, 'ওরে অসভ্য বনমানুষের দল! তোরা নাকি আমাদের বলি দেবার মতলব করেছিস? তোরা কি জানিস না যে আমরা একটা কড়ে আঙুল তুললে তোরা সবাই এখনই ভগবান জুজুর অভিশাপে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবি! তোরা আমাদের ক্ষমতা দেখতে চাস? বেশ, তবে তাই দেখ! এই চেয়ে দেখ, আমার হাতে একটা জিনিস রয়েছে। এই জিনিসের গুণে চন্দ্র-সূর্য পাহাড় আর সুদূরের সমস্ত দৃশ্য আমাদের কাছে এসে ধরা দেবে। যদি বিশ্বাস না হয়, জুজুর প্রধান পুরোহিত আমার কাছে আসুক, স্বচক্ষে সে আমার ক্ষমতা দেখে যাক।'

বীরেনদার হাতের জিনিসটা আর কিছুই নয়, দূরবিন।

রানি বীরেনদার কথাগুলো সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন! জুজুর প্রধান পুরোহিতের মুখে বিস্ময় আর সন্দেহের ভাব ফুটে উঠল। পায়ে পায়ে থতমত খেয়ে সে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। বীরেনদা দূরবিনটা তার চোখের সামনে ধরলে। দূরবিনের ভিতর দিয়ে মিনিটখানেক বাইরের জগৎ দেখেই বুড়ো পুরুতের গা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল–তাড়াতাড়ি দূরবিন থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে সে আগে হতভম্বের মতন আমাদের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে, তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় কী একটা চিৎকার করতে

করতে দ্রুতপদে পুরুতদের দলের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ে গা ঢাকা দিলে কোথায় কে জানে!

জনতার ভিতরে জাগল বহুকণ্ঠের চিৎকার! রানি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'ওরা বলছে আপনারা সবাই স্বর্গীয় যাদুকরের বাচ্ছা!

তারপর দ্বিতীয় ম্যাজিক-এর পালা হচ্ছে আমার। একখানা আতশিকাচ সকলের চোখের সামনে উঁচু করে তুলে ধরে আমি চেঁচিয়ে বললুম, হে জুজুর ভক্তবৃন্দ! তোমরা সবাই শোনো। আমার হাতে এই যে পবিত্র জিনিসটি দেখচ, বহু পুণ্যফলে এটি আমি লাভ করেছি। এর মহিমায় স্বয়ং সূর্যদেব আমাদের বশীভূত হয়েছেন। এখন আমি আদেশ করলেই তিনি আমার সমস্ত শত্রুকে ভস্মীভূত করে ফেলবেন। তোমাদের কেউ যদি পরীক্ষা করতে চাও তাহলে এগিয়ে এসো,—আমি তার শরীরের যে-কোনও স্থানে ভয়ানক আগুন জ্বেলে দেব!'

রানি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু বিপুল জনতা আতঙ্কে একেবারে স্থির হয়েই রইল, একজন লোকও সাহস করে অগ্রসর হল না!

তখন আমি আর কিছু না বলে একখানা শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তারই উপরে আতশিকাচ ধরে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করলুম। পাতাখানা যেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, সমস্ত মাঠের লোক একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগল–সে ভীষণ চিৎকারে কান যেন ফেটে যাবার মতন হল!

চিৎকার থামলে পর তৃতীয় ম্যাজিক দেখালে অমিয়। প্রথমে সে একটা দেশলাইয়ের বাক্স সকলকে দেখালে। তারপর বললে, 'এই যে পবিত্র দ্রব্য, এটি ভগবান জুজু নিজে আমাকে দান করেছেন। এর সঙ্গে

সর্বগ্রাসী অগ্নিদেব আমার কাছে বন্দি হয়ে আছেন। এই দ্যাখো তার প্রমাণ–বলেই সে ফস করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেলে ফেললে।

তারপর আবার সেই আকাশ-কাঁপানো চিৎকার! পুরুতদের পানে তাকিয়ে দেখলুম, তারাও চিৎকার করছে না বটে, কিন্তু তাদের সকলকার চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত, মুখ ভয়ে বিবর্ণ! .

বীরেনদা বললে, ‘এইবারে তোমরা আমাদের আর এক শক্তি দ্যাখো! আমাদের হাতে এই যে তিনটি জিনিস দেখছ, এগুলি হচ্ছে আকাশের বজ্র। ভগবান জুজু এই বজ্রের দ্বারা শত্রু বধ করে থাকেন। এরই দ্বারা আমরা সেদিন জুজুর এক অবাধ্য পুরুতের হাত ভেঙে দিয়েছি–দয়া করে কেবল তার প্রাণটা আর নিইনি।’

সামনের একটা গাছের উঁচু ডালে এক ঝাঁক শকুনি বসেছিল। আমরা প্রত্যেকেই তাদের এক-একটাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুললুম! ঘোড়া টেপার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনটে বন্দুক গর্জন করে উঠল এবং পরমুহূর্তে তিনটে শকুনি শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে নেমে মাটির উপরে পড়ে গেল।

বিপুল জনতার ভিতর থেকে এবারে যে ভয়ার্ত চিৎকার উঠল, তার আর তুলনা নেই। তারপরেই সেই হাজার হাজার লোক মাঠের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করতে লাগল আমাদের উদ্দেশে।

বীরেনদা বললেন, হে জুজুর প্রিয় সন্তানগণ! তোমাদের কোনও আশঙ্কা নেই। তোমরা যদি অনুগত থাকো, তাহলে আমরা তোমাদের মঙ্গল করব। কিন্তু আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করলে আমাদের এই বজ্র তোমাদের কারুকেই ক্ষমা করবে না, অতএব সাবধান, সাবধান, সাবধান?

তারপরেই জুজুর পুরুতদের দল এগিয়ে এসে মঞ্চের সামনে দুই হাত তুলে, মাথা হেট করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

রানি বললেন, ‘পুরুতরা স্বীকার করছে, আজ থেকে ওরা আপনাদের দাস হয়ে রইল। আপনারা হাত তুলে ওদের অভয় দিন!

আমরা অভয় দিলুম মনে মনে হাসতে হাসতে!

মৃত্যু-যুদ্ধ

এই যে বিজয়া মেয়েটি, আমাদের সকলেরই চোখে একে বড়ো মিষ্টি লাগল!

দেশে যে-সব আমাদের চেনা মেয়ে ছিল তাদের সঙ্গে বিজয়ার কিছুই মেলে না–সে বাঙালির মেয়ে, ওই পর্যন্ত! আর তার কারণও বোঝা শক্ত নয়। বাল্যবয়স থেকেই সে এই অসভ্যদের দলের ভিতরে বন্য প্রকৃতির মাঝখানে মানুষ হয়েছে–আদব-কায়দা বা সামাজিকতা, কিছুই সে শেখেনি এবং যেটুকু শিখেছিল তাও বোধহয় ভুলে গিয়েছে। তাই বাঙালি পুরুষদেরও চেয়ে সে বেশি সপ্রতিভ এবং বেশি স্বাধীন–পাঁচজন সভ্য মানুষের সঙ্গে মিশতে গেলে মানুষের যেটুকু আত্মগোপন করার দরকার হয়, সেটুকু খল-কপটতাও তার কথায় বা ব্যবহারে বা ভাব-ভঙ্গিতে ছিল না!

ফলে দিন-দশেকের ভিতরেই বিজয়া আমাদের সঙ্গে একেবারে আমাদেরই মতন হয়ে মিলে-মিশে গেল–আমরা যে যুবক এবং সে যে রূপসী যুবতী, তার ভাব দেখলে মনে হত, এ সংকোচ তার মনের ভিতরে যেন একবারও উঁকি দেয়নি -

সে আমাদের নাম ধরে 'তুমি' বলে ডাকতে শুরু করেছিল এবং আমাদেরও মানা করে দিয়েছে, আমরাও যেন তার 'রানি' উপাধি বাদ দিয়ে নাম ধরে তাকে ডাকি!

এমন এক কল্পনাতীত অবস্থায় তিন যুবকের ভিতরে একটিমাত্র যুবতী এসে পড়লে ঔপন্যাসিকরা কত রকম মেলোড্রামাটিক ঘটনার সরস কল্পনা করতে পারতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের এই মেলামেশার ভিতরে এখনও পর্যন্ত কোনও বিচিত্র রোমান্স বা ওই জাতীয় আর কোনও-কিছুর দেখা পাওয়া যায়নি।

তবে রোমান্সের একটা সন্দেহজনক ছায়া বোধ হয় বীরেনদা আর বিজয়ার মাথার উপরে দুলছে—যদিও সে ছায়াকে এখনও কায়া বলে ভ্রম হয় না।

বীরেনদীকে কোনও প্রশ্ন করলেই সে ভারী খাপ্পা হয়ে ওঠে। আজকাল আবার বলতে শুরু করেছে যে, দ্যাখো, তোমরা যদি এমন ফাজলামি করো, তাহলে এবার আমি গায়ের জোরে তোমাদের মুখ বন্ধ করব!'

অমিয় বলে, 'বীরেনদা! ইংরেজরা বছরে বছরে এত লোককে ফাসি দিয়েও আর জেলখানায় পাঠিয়েও দুর্বল ভারতবাসীর মুখ গায়ের জোরে বন্ধ করতে পারেনি। গায়ের জোরে তুমিই বা কেমন করে আমাদের মুখ বন্ধ করবে?..সত্যি বীরেনদী, তোমার পায়ে পড়ি, বলো না, তুমি কাকে ভালোবাসো?'

বীরেনদা রেগে তিনটে হয়ে চেঁচিয়ে বলে, কারুকে না, কারুকে না,—আমি ভালোবাসি খালি নিজেকে!'

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। মনে হচ্ছে, ওই সমুজ্জ্বল রত্ন-গোলকই যেন সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীর আশা-আকাঙক্ষার কেন্দ্র, নিখিল মানবের চিত্ত

তাই নিত্য ওরই মধ্যে গিয়ে আলোকশয্যায় শুয়ে থাকতে আর অনন্ত আনন্দের স্বপ্ন রচনা করতে চায়।

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। আর বিপুল সমারোহ ভরা সেই অসীম নীলজলের জগৎ গলিত হীরকস্রোতে পরিণত হচ্ছে।

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। আর জ্যোৎস্না-নির্বরে আমাদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত রূপে অপরূপ হয়ে যাচ্ছে। এবং প্রাণ উচ্ছসিত হয়ে বলতে চাইছে, মাটি-মায়ের উদার কোলে, এই সুন্দর পৃথিবীতে আমরা যে বেঁচে আছি, আমরা যে খেলা করছি, এর চেয়ে বড়ো কথা কিছু নেই, আর কিছু নেই!

বালির নরম বিছানায় আমরা তিনজনে বসে আছি আর বিজয়া ছিল উপুড় হয়ে শুয়ে–দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে দেহের উপরার্ধ তুলে!

অজানা দ্বীপের নাম-না-জানা পাখি নিজের ভাষায় কী গান গাইছিল এবং বাতাস করছিল তীরের সবুজ বনের সঙ্গে প্রেমালাপ।

বীরেনদার চোখের দৃষ্টি আজ অনন্ত সাগরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে!

বিজয়া খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বীরেনদার মুখের পানে তাকিয়ে রইল; তারপর পাতলা ফুলের পাপড়ির মতন ঠোঁট দু-খানি মধুর হাসিতে রঙিন করে তুলে বললে, বীরেন, কী ভাবচ ভাই?’

বীরেনদা চমকে মুখ ফেরালে; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, দেশের কথা।

—কেন ভাই তোমরা খালি দেশের কথা ভাব? আমার কাছে থাকতে কি তোমাদের ভালো লাগে না?

—কেন ভালো লাগবে না বিজয়া! খুব ভালো লাগে। কিন্তু সোনার খাঁচায় বসে বনের পাখি মনের সুখে গান গাইলেও সে কি বনের স্মৃতি মনের ভিতর থেকে মুছে ফেলতে পারে?

বিজয়া আর কোনও জবাব দিলে না।

অমিয় আনমনে গুনগুন করে গাইতে লাগল–

আজ আকাশের রূপ-সায়রে
যায় ভেসে যায় আঁখি,
মনকে কে আজ দেয় পরিয়ে
রাঙা ফুলের রাখি!

কোন রূপসী দৃষ্টি-বীণায়
নীরব গানের ছন্দ শোনায়
চিত্ত আমার নৃত্য করে
স্বপ্নপুলক মাখি!

তারার মালা পরবে বলে
ছুটল চাঁদের ঘুম,
বরে ছায়ায় উঠল বেজে
ঝিল্লির ঝুমঝুম!

শ্যামল ধরায় আলোয় আলো!

কে আজ আমায় বাসবে ভালো!

তাই তো আমি মনে মনে

নাম ধরে তার ডাকি!

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল! তারপর বিজয়া আবার বীরেনদীকে শুধোলে, আচ্ছা ভাই, আজ যদি এখানে হঠাৎ কোনও জাহাজ এসে পড়ে, তাহলে তোমরা কী করো?

— দেশে চলে যাই। ---

— আমাকে এখানে ফেলে?

— তোমাকে ফেলে যাব কেন? তোমাকেও নিয়ে যাব!

বিজয়া দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বললে, বলেছি তো ভাই, দেশের দরজা আমার সামনে বন্ধ। সেখানে আপন বলতে আমার আর কেউ নেই!'

—'কেন, আমরা তো আছি বিজয়া! আমাদের কাছে তুমি থাকবে?

—তোমাদের সমাজ আর আমাকে চাইবে কেন? এই বুনোদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার যে জাত গিয়েছে।'

—মানুষের জাত কখনও যায় না বিজয়া! মানুষ–'

বীরেনদার মুখের কথা মুখেই রইল–হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে একসঙ্গে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটা বন্দুক গর্জন করে উঠল!—তারপরেই অসংখ্য লোকের চিৎকার ও আর্তনাদ এবং তারপর আবার বন্দুকের পর বন্দুকের আওয়াজ!

আমরা সকলেই একলাফে দাঁড়িয়ে উঠলুম! বিজয়া ভয়ে আঁতকে বলে উঠল, ও কীসের গোলমাল? অত বন্দুক কে ছোঁড়ে? গ্রাম থেকে আমরা

খানিক তফাতে এসেছি। সমুদ্রতীর আর গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচিলের মতন গাছের সারি। কিন্তু গাছগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে দাউ-দাউ-দাউ আগুনের রক্তহাসি ফুটে উঠল আচম্বিতে। বেশ বোঝা গেল, গ্রামের ভিতরে একটা বিপুল অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়েছে। ...বন্দুকের শব্দ সমান চলছে—মানুষের আর্তনাদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে!

বিজয়া বললে, ‘গায়ে আগুন লেগেছে! আমার প্রজারা কাঁদছে? সে ছুটে গাঁয়ের দিকে যেতে গেল!

বীরেনদা এগিয়ে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে, কোথা যাও? দাঁড়াও!

বিজয়া আকুল স্বরে বললে, ছাড়ো বীরেন, হাত ছাড়ো। দেখছ না, আমার প্রজারা বিপদে পড়েছে? তোমরাও চলো!

বীরেনদা মাথা নেড়ে বললে, ‘তুমিও যাবে না, আমরাও যাব না। যেচে মরণের মুখে গিয়ে লাভ কী! বুঝছ না, বোম্বেটে চ্যাঙের দল জুজুর মন্দির আক্রমণ করেছে? ওরাই বন্দুক ছুঁড়ছে আর সকলের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।

বিজয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটু থেমে বললে, তুমি ঠিক বলেছ। এতক্ষণে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু উপায় কী? চ্যাং আমার নিরীহ প্রজাদের খুন করবে, আর আমরা এখানে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব? তা তো হয় না। তার চেয়ে আমি চ্যাঙের কাছে মিনতি করে বলিগে, ‘একবার আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম, আজ তুমি আমার প্রজাদের ক্ষমা করো। সে আমার কথা শুনবে বোধ হয়।’

—সে তোমার প্রজাদের ক্ষমা করবার জন্যে এতদূরে আসেনি বিজয়া! চ্যাংকে এখনও তুমি চেনোনি—মানুষের আকারে সে রাক্ষস। তার কাছে গেলে তুমি নিজেও বিপদে পড়বে!'

বিজয়া দৃপ্তকণ্ঠে বললে, তাহলে চলো, আমরাও তাকে বাঁধা দেব!'

বীরেনদা অনুশোচনার স্বরে বললে, তাকে বাঁধা দেবার উপায় থাকলে আমরাই কি এতক্ষণ এখানে থাকতুম? দেখছ না, আমরা বন্দুক আনিনি যে! এখন বন্দুক আনতে গেলেই বন্দি হব!'

বিজয়া হতাশ ভাবে বসে পড়ল। অগ্নিশিখায় তখন আকাশের একদিক লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু বন্দুকের শব্দ কমে এল। গোলমালও অনেকটা থেমে এসেছে—কেবল শোনা যেতে লাগল, কতকগুলো লোক চিৎকার করে কাঁদছে।

আমি বললুম, বিজয়া, তোমার সমস্ত প্রজা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পালিয়ে গিয়েছে। কাঁদছে খালি আহতেরা।'

অমিয় বললে, আঃ, হাত দু-খানা যে নিশপিশ করছে! বন্দুক না এনে কী বোকামিই করেছি, চিনে বাঁদরগুলোকে দেখিয়ে দিতুম মজাটা!

বীরেনদা বললে, ভুল আর শোধরাবার উপায় নেই। ...কিন্তু আমাদের পক্ষে আর এখানে থাকাও নিরাপদ নয়।'

বিজয়া বললে, 'চ্যাং ভাবছে জুজুর মন্দির লুট করে রাজার ঐশ্বর্য পাবে। কিন্তু তার সে আশায় আমি ছাই দিয়ে এসেছি!'

—কী রকম?

—তোমাদের মুখে যখনই শুনলুম দলবল নিয়ে চ্যাং আবার এই দ্বীপে এসেছে, তখনই আমি সাবধান হয়েছি। জুজুর সমস্ত ধনরত্ন আমরা

এক লুকনো জায়গায় পুঁতে রেখেছি– চ্যাং সারাজীবন ধরে খুঁজলেও তা পাবে না!

বীরেনদা বললে, তাহলে চলো চলো, আমাদের আর এক মুহুর্তও এখানে থাকা উচিত নয়! জুজুর মন্দির খালি দেখে চ্যাং এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমাকে ধরবার জন্যে চারিদিকে লোক পাঠিয়েছে। এখানে থাকলে তুমি বিপদে পড়বে!’

অমিয় বললে, আর পালানো মিছে! ওই দ্যাখো, কারা এদিকে আসছে।’

সর্বনাশ! সত্যই তো, গাছের তলার পথ দিয়ে জন দশ-বারো লোক হন হন করে এগিয়ে আসছে–আমাদের দিকেই!

আগন্তুকদের সকলের আগে আগে আসছে কং হিং এবং তার পিছনেই বিপুলবপু চ্যাং–সমুদ্রের প্রবল বাতাসে তার সেই লম্বা গোঁফ-জোড়া ফরফর করে দু-দিকে উড়ছে!

কং হিং তার সদাহাস্যময় মুখে আরও বেশি হাসি ফুটিয়ে বললে, ‘আরে আরে, বীরুবাবু যে! আরে আরে, সরুবাবু–অমিবাবুও যে! তাহলে তোমরা বেঁচে-বর্তে মনের সুখে আছ? বেশ, বেশ! আমি ভেবেছিলুম এতদিনে তোমরা পাতালের ভূত হয়ে পেট ভরে জলপান করছ!’

বীরেনদা বললে, আমরাও ভেবেছিলুম তোমাদের ওই সুচেহারা এ জন্মে আর দেখতে পাব না। তাহলে মানোয়ারি জাহাজের গোলা তোমাদের হজম করতে পারেনি?’

—না। বড়োজোর চণ্ডু কি গুলি খাওয়ার অভ্যাস আছে, ও গোলা-টোলা আমাদের ধাতে সহ্য হয় না।...আরে, তোমাদের সঙ্গে ওটি কে? এই

দ্বীপের রানি বুঝি? আমরা যে ওঁকেই খুঁজতে এখানে এসেছি–সেলাম, রানিসাহেবা!

—বিশেষ কিছুই নয়। ওঁর কাছে খালি জানতে এসেছি, জুজুর ধনরত্ন উনি কোথায় সরিয়ে ফেলেছেন?

বিজয়া সিঁধে হয়ে দাঁড়িয়ে তেজ-ভরা গলায় বললে, সে খোজে তোমাদের দরকার কী?

কং হিং খিল খিল করে হেসে বললে, দরকার একটু আছে বই কি!'

—আমি বলব না।

—রানিসাহেবা, একটু বুঝে-সুঝে কথা বলবেন। এই যে চ্যাং ভায়াকে দেখছেন, একে চেনেন তো? এর মেজাজ বড়ো ভালো নয়। আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গে আসুন, ধনরত্বের জায়গাটা কোথায় দেখিয়ে দিন। নইলে–

—নইলে?

—নইলে আমরা আদর করে আপনাকে ধরে নিয়ে যাব।

—আমি যাব না?

চ্যাঙের দিকে ফিরে কং হিং মিনিটখানেক চিনে ভাষায় কী কথা কইলে।

চ্যাঙের কুৎসিত মুখের একটামাত্র চক্ষু দপ করে হঠাৎ জ্বলে উঠল!—তাড়াতাড়ি সে বিজয়ার দিকে এগিয়ে এল।

কিন্তু বীরেনদাও তৈরি হয়ে ছিল–সে তখনই চ্যাং আর বিজয়ার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল এবং অত্যন্ত শান্তভাবে বললে, আমাকে বধ না করে তুমি বিজয়ার গা ছুতে পারবে না!

কং হিং বিস্মিত কণ্ঠে বললে, ‘ও কী বীরুবাবু, ও কী! আমাদের দলেরই লোক হয়ে তুমি সর্দারকে বাঁধা দিতে চাও?’

অমিয় খাপ্পা হয়ে বললে, ‘কে তোমাদের দলের লোক? জোর করে আমাদের হাতে নীলগোলাপের ছাপ মেরে দিয়েছ বলেই কি ভাবছ, আমরা তোমাদের গোলাম হয়ে থাকব?

কং হিং হাসিমুখে বললে, ‘তোমরা বিদ্রোহী হলেও আমাদের কিছু ভয় নেই। এইখানেই আমাদের দলের আরও কত লোক আছে, তা দেখছ তো? দরকার হলে আরও লোক আসবে। তার ওপরে তোমরা নিরস্ত্র। আমাদের সঙ্গে গোলমাল বাঁধালে বেশি সুবিধে করে উঠতে পারবে কি?’

বীরেনদা দৃঢ়স্বরে বললে, আমাকে বধ না করে কেউ বিজয়ার একগাছি চুলও ছুঁতে পারবে না।’

কাপড়ের ভিতর থেকে ফস করে একখানা চকচকে ছোরা বার করে বিজয়া বললে, ‘আমাকে কেউ ছোবার আগে এই ছোরার কথা যেন ভুলে না যায়। এই বলে সে ছোরাখানাকে বাগিয়ে ধরে এমনভাবে রুখে দাঁড়াল যে, তার সেই মহিমময়ী তেজস্বিনী মূর্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সে মূর্তি যেন বাঙালির মেয়ে নয়,—বাংলা দেশের মানুষ হলে বিজয়া হয়তো এমন বুকের-রক্ত-তাতানো অপূর্ব মূর্তি ধারণ করতে পারত না! হ্যাঁ, এই বিজয়া সিংহবাহিনীরই জাত বটে।

অমিয় নিজের বিপদের কথা ভুলে উল্লসিত কণ্ঠে গেয়ে উঠল–

তুমি বিজয়িনী নারী!
কখনও মধুর, কখনও ভীষণ–

তোমায় চিনিতে নারি!
নয়নে প্রলয়-মেলা,
মরণ খেলিছে খেলা,
ও-রূপ দেখিলে চরণের তলে
হাসিয়া মরিতে পারি!

কং হিংয়ের হাসি আরও মিষ্ট হয়ে উঠল। সে বললে, 'ছোকরা, তুমি গান থামাও। এখন গান শোনবার সময় নয়। ..বীরুবাবু, চ্যাং বলছে যে, তুমি দলের লোক বলেই সে এখনও সহ্য করে আছে, নইলে এতক্ষণে আছাড় মেরে তোমার দেহকে গুড়ো করে দিত?

বীরেনদা সহজ ভাবেই বললে, বেশ তো, চ্যাং একবার সেই চেষ্টাই করে দেখুক না?

—বলো কী বীরুবাবু! তুমি কি শোনোনি, চ্যাঙের গায়ে জোর কত? চিনদেশে সে একজন বিখ্যাত পালোয়ান ব্যক্তি—জীবনে সে কখনও কোনওদিন কারুর কাছে হারেনি!

বীরেনদা হেসে বললে, 'জীবনে আমার সঙ্গেও চ্যাং কোনওদিন লড়াই করেনি।'

—তাহলে মরো। —বলেই কং হিং চিনে-কথায় চ্যাংকে কী বললে।

বোধ হয় বীরেনদা তার সঙ্গে লড়তে চায় শুনেই চ্যাং আকাশের দিকে মুখ তুলে বিশ্রী ঝাঁঝরা গলায় তীব্র অট্টহাস্য করতে লাগল—তেমন ভয়ানক হাসি আমি আর কখনও শুনিনি!

বীরেনদা ঠাস করে চ্যাঙের গালে এক চড় মেরে বললে, তোমার ওই বেসুরো হাসি আমার ভালো লাগছে না, শিগগির চুপ করো।

চড় খেয়ে চ্যাঙের মুখের ভাব যে-রকম হল, দেখলেই বুকের কাছটা শিউরে ওঠে। তার সেই প্রায় সাত ফুট লম্বা দেহ যেন আরও উঁচু হয়ে উঠল এবং ভীষণ এক গর্জন করে সিংহের মতন সে বীরেনদার উপর লাফিয়ে পড়ল!

স্যাঁৎ করে একপাশে সরে যেতে যেতে বীরেনদা দুম করে চ্যাঙের পাছায় এক লাথি বসিয়ে দিলে এবং টাল সামলাতে না পেরে চ্যাং তখনই দড়াম করে মাটির উপরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বীরেনদা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে।

চ্যাং-ও প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে বীরেনদাকে। তারপরে সেই আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থাতেই দুজনে গড়াতে গড়াতে খানিক দূর চলে গেল।

বিজয়া কৌতুকভরে বলে উঠল, বাহঃ বীরেন, চমৎকার, চমৎকার!

তারপর সে যে বিষম মরণ-যুদ্ধ শুরু হল, আমি তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না! চ্যাঙের গায়ে যে এমন আশ্চর্য শক্তি, আমিও তা কল্পনা করিনি। এতক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু এখন আমার ভয় হতে লাগল, আজ বুঝি বীরেনদার মান ও প্রাণ দুইই একসঙ্গে নষ্ট হয়!

কখনও বীরেনদা চ্যাঙের উপরে, কখনও চ্যাং বীরেনদার উপরে এবং ধাক্কাধাক্কি ও আছড়া-আছড়ির সঙ্গে ঘুসি ও চড় সমান চলতে লাগল! বুঝলুম, চ্যাংও কুস্তি, যুযুৎসু ও বক্সিং জানে। তার উপরে তার দেহও বীরেনদার চেয়ে লম্বায়-চওড়ায় দুয়েই বড়ো। হয়তো বীরেনদার গায়ের জোর বেশি, এতক্ষণ ধরে তাই সে গুরুভার চ্যাঙের সঙ্গে যুঝতে পারছে!

আর বীরেনদার বয়সও চ্যাঙের চেয়ে অনেক কম, তাই তার দমও বোধ হয় বেশি!

রক্তে দুজনের সারা অঙ্গ ভেসে যাচ্ছে এবং দাপাদাপিতে সমুদ্রতটের বালিগুলো উড়ছে যেন দমকা ঝড়ের মুখে–আর ঘুসোঘুসি ও পরস্পরের গা-ঠোকাঠুকিতে শব্দ হচ্ছে যেন কাঠের উপরে কে খট খট করে কাঠ ঠুকছে!

অমিয় অশ্রান্তভাবে বলে চলছে– 'এইবার বীরেনদা! মারো এক ধোবি প্যাঁচ! না, না,—কাঁচি মারো! চ্যাং কাঁধ নামিয়েছে–এইবেলা ওর চোয়ালে একটা নক-আউট ব্লো ঝাড়ো! সাবধান বীরেনদা, পিছিয়ে যেয়ো না–পিছনে একটা গর্ত! আর ভয় নেই বীরেনদা, চ্যাং খুব হাঁপাচ্ছে–তুমি ওকে দমে মেরে দেবে প্রভৃতি।

বিজয়া বলছে, শাবাশ, বীরেন, শাবাশ! চ্যাং এইবারে ব্যাং হল বলে।
'

ফিরে দেখলুম, চিনে-বোম্বেটেগুলো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে মল্লযুদ্ধ দেখছে, কিন্তু কং হিং দাঁড়িয়ে আছে পাথরের পুতুলের মতন নিশ্চল হয়ে এবং তার ঠোঁটে তখনও সেই সদাপ্রস্তুত হাসির লীলা!

এতক্ষণে আমার মনে আশা এল। সত্যি, চ্যাং বেজায় হাঁপাচ্ছে!

হঠাৎ চ্যাং আর্তনাদ করে উঠল! তার সেই একটামাত্র চোখের উপরে গিয়ে পড়ল বীরেনদার এক বজ্রমুষ্টি! ডান হাতে চোখটা চেপে ধরে সে তাড়াতাড়ি পিছন দিকে সরে গেল!

কিন্তু বীরেনদা তাকে ছাড়লে না, এগিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎবেগে সে উপরি উপরি আরও গোটাকয়েক ঘুসি বৃষ্টি করলে–অন্ধ চ্যাং প্রথমে হাঁটু গেড়ে

বসে, তারপর শুয়ে পড়ে অত্যন্ত অসহায়ভাবে বিষম যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে ছটফট করতে লাগল!

বীরেনদা মাতালের মতন টলতে টলতে ফিরে দাঁড়াল, হয়তো সে-ও পড়ে যেত—কিন্তু বিজয়া ছুটে গিয়ে দুই হাতে তাকে আকুলভাবে জড়িয়ে ধরলে!

কং হিং তিক্ত স্বরে হেসে উঠে চিনে ভাষায় চেঁচিয়ে কী বললে—সঙ্গে সঙ্গে আট-দশ জন বোম্বেটের আট-দশটা বন্দুকের মুখ ফিরল আমাদেরই দিকে!

—সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ হল এবং মনের ভিতর দিয়ে যেন মরণের একটা ঝড় বয়ে গেল!

—কিন্তু আমরা মরলুম না, মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল চার-পাঁচ জন চিনে-বোম্বেটেই! বিস্মিতভাবে ফিরে দেখি, গাছের তলা থেকে পরে পরে মানোয়ারি গোরার দল বেরিয়ে, বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে!

আবার কতগুলো বন্দুকের আওয়াজ! কং হিং আর বাকি বোম্বেটেগুলো হতাহত হয়ে মাটির উপরে আছড়ে পড়ল।

জাহাজি কাপ্তেনের পোশাক-পরা এক সাহেব ছুটে এসে বীরেনদার দুই হাত ধরে ঝাঁকনি দিয়ে প্রশংসা-ভরা গলায় বললে, আমরা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি! তুমি বীর! বীরেনদা শ্রান্ত হয়ে বালির উপরে বসে পড়ে বললে, "তোমরা আমাদের প্রাণ আর এই বীর-মহিলার মান বাঁচালে! ভগবান তোমাদের পাঠিয়েছেন। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ! এখন এর বেশি আর কিছু বলবার শক্তি আমার নেই!

সাহেব বললে, এই ভীষণ একচোখো বোম্বেটের জন্যে চিন-সমুদ্রে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সরকার এর দলকে দমন করার জন্যে এই মানোয়ারি জাহাজ পাঠিয়েছেন। আজ ক-দিন ধরে আমরা পিছনে পিছনে আছি, কিন্তু কিছুতেই এদের ধরতে পারিনি। আজও হয়তো এই হলদে শয়তানের বাচ্চারা আমাদের চোখে ধুলো দিত, কেবল তোমাদের জন্যেই আজ একে বন্দি করতে পারলুম। তোমরাও আমার ধন্যবাদ নাও।

ওদিকে চ্যাং আর-একবার অনেক কষ্টে উঠে বসবার প্রাণপণ চেষ্টা করলে, কিন্তু একটু উঠেই আবার বালির উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

কং হিং দুই হাতে ভর দিয়ে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে উঠে বসল—তখনও তার সারা মুখ হাসছে আর হাসছে! তেমনি হাসতে-হাসতেই সে বললে, বীরুবাবু! তোমাদেরই জিৎ। তোমাদের বাঙালি জাতকে লোকে কাপুরুষ আর দুর্‌বল বলে কেন? তোমরা বীর, তোমরা মরণের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মতন হাসতে পারো, তোমরা দুর্দান্ত চ্যাং আর তার দলকে কুপোকাত করলে! মরবার সময়ে আমি তোমাদের নমস্কার করছি—নমস্কার, নমস্কার!”— বলেই দুহাত জোড় করে কপালে ছুঁইয়ে সে আবার এলিয়ে পড়ে গেল—আর একটুও নড়ল না!

কং হিংয়ের রহস্যময় হাস্য এ পৃথিবীতে আর কেউ দেখতে পাবে না!

সব ভালো যার শেষ ভালো

আজ সকালের প্রথম সূর্যের আলোয় আকাশ আর পৃথিবী যখন অগাধ শান্তির হাসি হেসে উঠল, আমাদের নৌকাও তখন ডাঙা ছেড়ে সেই মানোয়ারি জাহাজের দিকে এগিয়ে চলল–কিছু দিন আগে যার ভয়ে আমরা এই অজানা দ্বীপে পালিয়ে এসেছিলুম!

পালিয়ে এসেছিলুম তিনজনে, কিন্তু ফেরবার সময়ে দলে একজন লোক বাড়ল। বোধ হয় বলতে হবে না যে, সে বিজয়া।

আমরা ছাড়া মানোয়ারি জাহাজেও আরও লোক বাড়ল। তারা সেই বোম্বেটের দল– গোরাদের বন্দুকের মুখ থেকে বেঁচে তারা চলেছে আজ ফাঁসিকাঠে ঝুলে মরবার জন্যে।

তারাও জুজুর ধনরত্ন পেলে না, আমরাও হাতে পেয়ে তা ছেড়ে দিলুম। কারণ বীরেনদা বললে, জুজুকে মানি আর না মানি, তিনি এই দ্বীপের দেবতা। এই দেবতার জন্যে বোম্বেটেদের হাতে অনেক সরল, নিরীহ অসভ্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে। তাদের রানিকেও আমরা হরণ করে নিয়ে চলেছি, এখন বেচারিদের দেবতারও গয়না চুরি করলে আমাদের পক্ষে মহাপাপ হবে!'

আমরাও বীরেনদার কথায় সায় দিলুম।

জাহাজ ছাড়ল।

ডেকের উপরে রেলিং ধরে বিজয়া দাঁড়িয়ে আছে–ছবির মতন স্তব্ধ হয়ে ... নীলাকাশের তলায় সেই সবুজ দ্বীপটি যখন ক্রমেই ছোটো হয়ে

স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল, তখন বিজয়ার চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল অশ্রুবিন্দুর পর অশ্রুবিন্দু!

বীরেনদা সমবেদনা-ভরা কণ্ঠে বললে,'বিজয়া, তুমি কাঁদছ!'

হাত দিয়ে চোখের জল মুছে বিজয়া বললে, 'একদিন দেশ ছেড়ে এখানে এসে অনেক কেঁদেছিলুম। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন স্বদেশ ছেড়ে আবার বিদেশের দিকে চলেছি।'

আমি বললুম, না বিজয়া, তুমি তো বিদেশে যাচ্ছ না! তোমার মনের স্বদেশ যে এখন ওই বীরেনদার বুকের ভিতরেই!'

অমিয় বললে, 'হায় রে হায়! এক যাত্রায় পৃথক ফল! বীরেনদা তো অ্যাডভেঞ্চার করতে এসে নিজের কাজ দিব্যি গুছোলেন, কিন্তু আমাদের বুকের ভিতরটাকেও স্বদেশ বলে মনে করবার লোক তো পাওয়া গেল না! অদৃষ্ট'

বিজয়া ফিক করে হেসে ফেলে বললে, কেন, তোমাদের হিংসে হচ্ছে নাকি? তাহলে আগে বললেই তো হত, আমার প্রজাদের ভিতরে কুমারী কন্যার অভাব ছিল না।'

অমিয় বললে, মন্দ কথা নয়! বীরেনদা দেখবেন রানির চাঁদমুখ, আর আমাদের দগ্ধ ভাগ্যে জুটবে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারের মতন দুঃস্বপ্ন! তোমার দয়াকে ধন্যবাদ দিচ্ছি বিজয়া!

বিজয়া বললে, 'কেন ভাই অমিয়। আমি তো চিরদিনই তোমাদের বন্ধু হয়ে থাকব! আমার মতো বন্ধুর প্রেম কি তোমাদের কাছে একেবারেই নগণ্য?

আমি বললুম, বাপ রে, সে কথা কি মুখে উচ্চারণ করতে পারি। তোমার চকচকে ছোরার কথা এখনও ভুলে যাইনি বন্ধু! তোমার প্রেম নগণ্য, এতবড়ো কথা বলবার মতন বুকের পাটা আমাদের নেই!

অমিয় গাইলে–

বন্ধু! তোমায় বরণ করি!
কোন গগনের চাঁদ ছিলে ভাই,
পড়লে ধরার ধুলোয় ঝরি।

সাত-সাগরে দিয়ে পাড়ি
এসেছিলেম তোমার বাড়ি,
আর কি গো সই, তোমায় ছাড়ি,
রইব এখন চরণ ধরি–
বন্ধু! তোমায় আপন করি!

চক্ষে তোমার রূপের স্বপন,
বক্ষে আদর-নীড়
কণ্ঠ তোমার ছন্দ-গানের
চলছে টেনে মীড়!

তোমার সাথে মেলা-মেশা,
এ যেন এক কীসের নেশা!

আমার যে ভাই প্রেমের পেশা,
তুমি যে ভাই প্রেমের পরি,—
বন্ধু! তোমায় প্রণাম করি!

সমাপ্ত

www.shishukishor.org